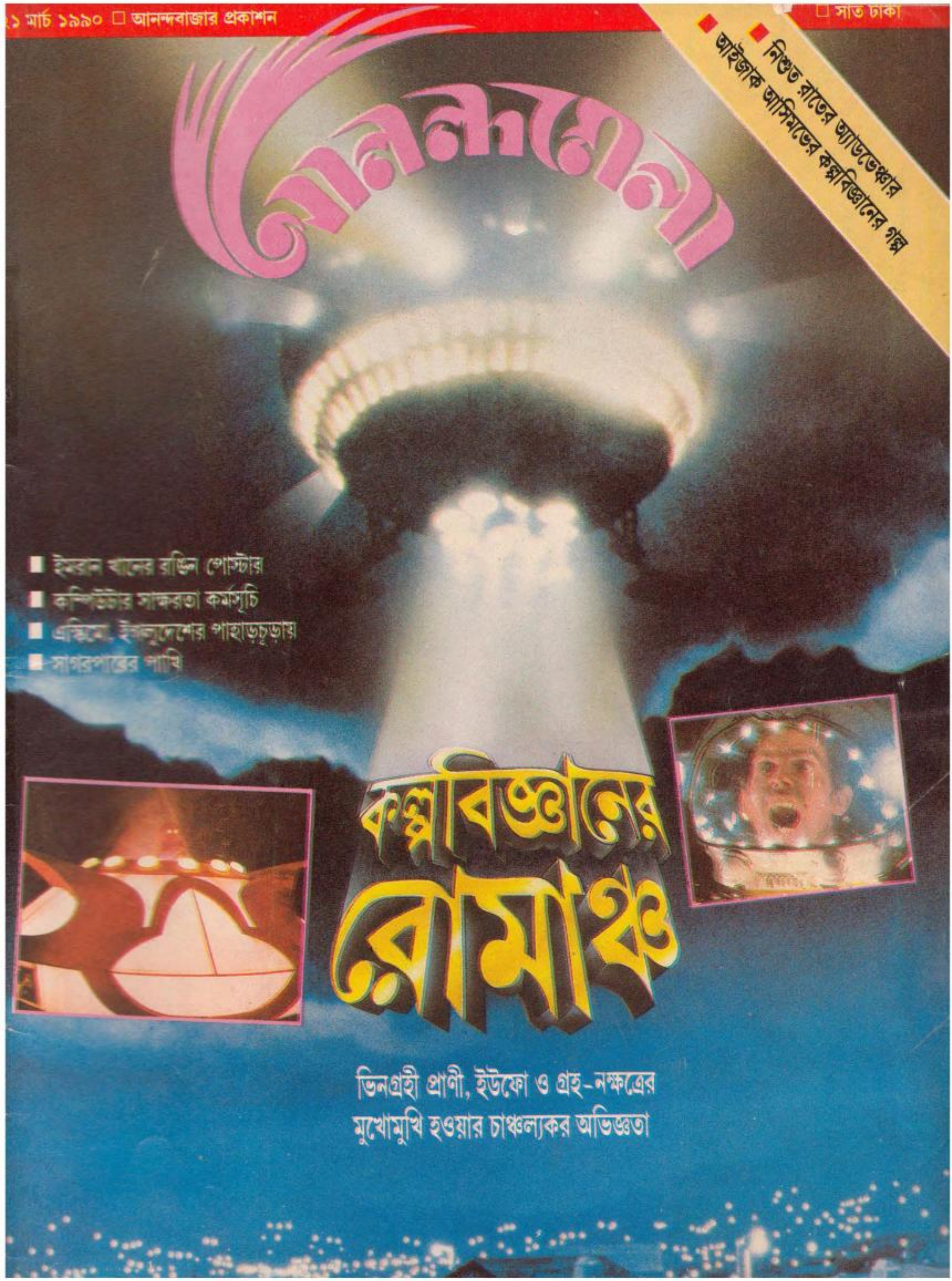

১ মার্চ ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন
□ সাত টাকা
আনন্দমেলা
■ নিস্তব্ধ রাতের অ্যাডভেঞ্চার
■ আইজাক আসিমভের কল্পবিজ্ঞানের গল্প
■ ইমরান খানের রঙিন পোস্টার
■ কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচি
■ এস্কিমো, ইনুদেশের পাহাড়চূড়ায়
■ সাগরপারের পাখি
কল্পবিজ্ঞানের রোমাঞ্চ
ভিনগ্রহী প্রাণী, ইউফো ও গ্রহ-নক্ষত্রের
মুখোমুখি হওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা

Lavender Dew
like slipping gently into love

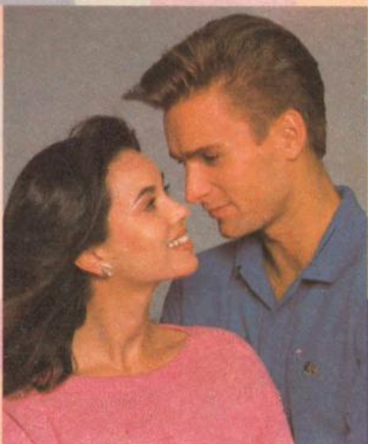

and staying there

The subtle luxury of
original French lavender—
yours in an exclusive
Soap and Talcum Powder.
Reward yourself with
Lavender Dew: it's like slipping
gently into love,
and staying there!

Lavender Dew. Gentle as love.

৭ চৈত্র ১৩৯৬ □ ২১ মার্চ ১৯৯০ □ ১৫ বর্ষ ২৪ সংখ্যা

আনন্দমেলা

■ সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ) ■

রহস্যের আলোছায়া আনন্দ বাগচী ৬০

■ গল্প ■

নিশুত রাতের অ্যাডভেঞ্চার রঞ্জন ভাদুড়ী ২৬

রোবি আইজাক আসিমভ ৩২

■ প্রচ্ছদকাহিনী ■

কল্পবিজ্ঞানের রোমাঞ্চ গৌতম চক্রবর্তী ১২

■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■

উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৭৫

সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ২১

■ বিশ্ববিচিত্রা ■

সাগরপারের পাখি পুষ্পেন্দু বিশ্বাস ৭

■ কমিক্স ■

টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৫১, গাবলু ৫৩, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩

■ টাকাকড়ি ■

দেশে দেশে টাকার আবির্ভাব : চিন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৪

■ কবিতা ■

মেদ্নিপুরের গাঁয়ে শ্যামলকান্তি দাশ ৬৬

■ বিজ্ঞান : গবেষণা ■

এখন অষ্টম গ্রহ প্লুটো কল্যাণকুমার দে ৫

■ প্রযুক্তিবিজ্ঞান ■

কম্পিউটার-সাক্ষরতা কর্মসূচি অসীমরতন ঘোষ ৫৪

■ অভিযান ■

এস্কিমো, ইগলুদেশের পাহাড়চূড়ায় অরিন্দম দেবনাথ ৪০

■ কেরিয়ার গাইড ■

জেভিয়ার লেবার রিলেশনস ইনস্টিটিউট অমর দাশ ৩৮

■ খেলাধুলো ■

রঙিন পোস্টার : ইমরান খান ৪২

কেমন চলছে অমৃতরাজের টেনিস-স্কুল সমীর চৌধুরী ৪৪

তরুণ ক্রিকেটার বিনোদ কাম্বলি সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৪৬

খেলার খবর ৪৭ মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৪৮

■ নিয়মিত বিভাগ ■

চিঠিচাপাটি ৪, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১০, শব্দসন্ধান ২২, আঁকিবুকি ৩৬, হাসিখুশি ৩৬, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫০, ক্যাম্পাস ৫৯, আকাশে ওড়ার কথা ৬৮, কুইজ ৭৮, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

■ প্রচ্ছদ-পরিচিতি ■

'ই.টি.'-র মহাকাশযান। (ইনসেট) 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' ও 'আউটল্যান্ড' ছবির দুটি দৃশ্য।

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল

শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য

সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

১২

গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস— সাহিত্যের এইসব শাখার তুলনায় কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর বয়স বেশি নয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে সারা বিশ্বের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। বিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান ও চলচ্চিত্রের মধ্যেও গড়ে উঠেছে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কল্পবিজ্ঞান কাহিনী যেমন পড়তে ভাল লাগে, তেমনই চলচ্চিত্রে সেই কাহিনীর অদ্ভুত সব ঘটনা দেখার মধ্যেও আছে রোমাঞ্চ। বাস্তবের সঙ্গে সেখানে মিশে যায় কল্পনা। এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে রোমাঞ্চকর এইসব ছবির কথা আলোচনা করা হয়েছে। কারা এই ধরনের ছবি তৈরি করে বিখ্যাত হয়েছেন, ছবির স্পেশাল এফেক্ট বলতে কী বোঝায়— আলোচনা করা হয়েছে এইসব প্রসঙ্গও।

৪৪

বিজয় অমৃতরাজ শুধু নামকরা টেনিস খেলোয়াড়ই নন, ভারতে বিশ্বমানের টেনিস খেলোয়াড় তৈরির জন্যও তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। মাদ্রাজের ব্রিটানিয়া অমৃতরাজ টেনিস স্কিম এদিক থেকে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এই টেনিস-স্কুল কেমন চলছে, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কেমন খেলছে, এ-বিষয়ে প্রকাশিত হল একটি প্রতিবেদন। এই স্কুলের শিক্ষার্থী লিয়ান্ডার পেজ টেনিসে ভারতের সেরা সম্ভাবনা। তাঁকে নিয়ে সবাই আশাবাদী।

৫

প্লুটো সম্বন্ধে নতুন-নতুন অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন বিজ্ঞানীরা। এর ফলে প্লুটো সম্বন্ধে পুরনো অনেক ধ্যানধারণাই চিরদিনের মতো বদলে গেছে। এরকমই কিছু নতুন তথ্যের আভাস দেওয়া হল একটি নিবন্ধে। প্লুটো নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা চলছে।

■ আগামী সংখ্যায় ■

স্বপনকুমার দাসের প্রচ্ছদকাহিনী
মহাসমুদ্রের আতঙ্ক

অসীমরতন ঘোষের প্রযুক্তিবিজ্ঞান
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)
লাফাং চু দ্রিদিম্বা রহস্য

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের কল্পবিজ্ঞানের গল্প
কাকাবাবুর ভয়

দেশ-বিদেশের লাইব্রেরি

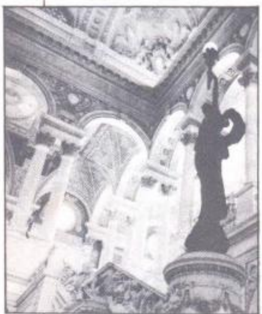

২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'বিশ্বের সেরা এক লাইব্রেরি' লেখাটিতে দি লাইব্রেরি অব কংগ্রেস-এর কথা পড়ে ভাল লাগল । লাইব্রেরিটির চমকপ্রদ বর্ণনা ও ছবি দেখে অনেক তথ্য জানতে পারলাম । বিশ্বের সেরা লাইব্রেরির মধ্যে বইয়ের সংগ্রহের দিক দিয়ে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারকে চতুর্থ স্থানে দেখে ভারতীয় হিসেবে গর্ব অনুভব করলাম । আনন্দমেলার পাতায় দেশ-বিদেশের লাইব্রেরি নিয়ে এরকম আরও লেখা পড়ার সুযোগ পেলে খুশি হব ।

দেবর্ষি দাস, তেজপুর, অসম

হিম্যান কমিক

'আনন্দমেলা'য় নতুন কমিক 'ব্যাটম্যান' প্রকাশিত হচ্ছে । এই কমিকটি দারুণ লাগে আমার । যদি আপনারা 'হিম্যান' কমিকটি শুরু করেন তা হলে আনন্দিত হব । এ ছাড়া আর-একটি অনুরোধ, এই কমিকটি দু'পাতা করে যেন প্রতি সংখ্যায় ছাপেন । আমি গোয়েন্দা উপন্যাসের ভক্ত । যদি গোয়েন্দা উপন্যাস আনন্দমেলায় ছাপেন, ভাল হয় ।

সৌরভ মাইতি, বেলদা, মেদিনীপুর

অসাধারণ প্রচ্ছদকাহিনী 'সুপারহিরো ব্যাটম্যান'

'আনন্দমেলা' ৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'সুপারহিরো ব্যাটম্যান' প্রচ্ছদকাহিনীটির জন্য ধন্যবাদ । এই লেখাটি পড়ে ব্যাটম্যান সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারলাম । আমাদের অনুরোধ, আপনারা যদি অরণ্যদেব, মিঃ ওয়াকার বা বেতালকে নিয়ে এরকম লেখা প্রকাশ করেন, ভীষণ আনন্দিত হব । ব্যাটম্যান বা স্পাইডারম্যান, সুপারম্যান, ম্যানড্রেকের মতো অতিপ্রাকৃত কোনও ক্ষমতা নেই এদের, তবে ব্যাটম্যানের মতো বুদ্ধিদীপ্ত মগজ আছে, আছে দুটি বলিষ্ঠ বাহু, যা সমাজবিরোধী দমনে প্রতিনিয়ত সাহায্য করে । কাজেই তাদের নিয়ে যদি আপনারা ব্যাটম্যানের মতো কোনও আকর্ষক প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশ করেন তবে ভাল হয় । কমিকসপ্রেমী পাঠক খুব খুশি হবেন আমাদের মতো ।

আশিস ভট্টাচার্য, জয়ন্ত সরকার, শিবাজি সরকার, বারাসত, ২৪ পরগনা

'আনন্দমেলা' ৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা নতুন অঙ্গসজ্জায় প্রকাশিত হয়েছে । ভীষণ ভাল লেগেছে এই নতুনত্ব । প্রতিটি সংখ্যাই আমি মন দিয়ে পড়ি । আরও ভাল লেগেছে এই সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী 'সুপারহিরো ব্যাটম্যান' । এই ধরনের আরও প্রচ্ছদকাহিনী ছাপা হলে ভাল লাগবে ।

সোমেশ্বর দত্ত, বাজে কুমারপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বর্ধমান

আমি নিয়মিত 'আনন্দমেলা' পড়ি । ৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী 'সুপারহিরো ব্যাটম্যান' পড়ে দারুণ ভাল লাগল । ব্যাটম্যান সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম । ছবিগুলিও খুব ভাল ।

টিঙ্কু মল্লিক, কোলড়া, হাওড়া

সম্প্রতি আমার প্রিয় পত্রিকায় নতুন-নতুন বিষয় সংযোজন খুব ভাল লেগেছে । আমি আনন্দমেলার প্রতিটি প্রচ্ছদকাহিনী এবং কেরিয়ার গাইড খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি । ৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রচ্ছদকাহিনী 'সুপারহিরো ব্যাটম্যান' পড়লাম । ব্যাটম্যানের সৃষ্টিরহস্য থেকে আরম্ভ করে তার নানা বিষয় সম্পর্কে অনেক তথ্য জানলাম । *অনন্ত মাহাত, ঝাড়গ্রাম কুমুদকুমারী ইনস্টিটিউশন, মেদিনীপুর*

৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা খুবই ভাল লেগেছে । নতুন অঙ্গসজ্জার মতোই দারুণ লেগেছে প্রচ্ছদকাহিনী 'সুপারহিরো ব্যাটম্যান' । ব্যাটম্যানের অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম লেখাটি পড়ে ।

অরুণ কেশরী
সাঁইথিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম
প্রদীপ্ত দে
কলকাতা-১০

বিদেশে পড়তে হলে

আমি মন দিয়ে 'আনন্দমেলা' পড়ি । অনেক বিভাগই আমার ভাল লাগে। বেশি ভাল লাগে 'কেরিয়ার গাইড' বিভাগটি । কেননা, এই বিভাগের লেখাগুলি পড়ে আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার পরামর্শ পাই । 'স্কলাসটিক 'অ্যাপটিটিউড' বা আমেরিকায় পড়াশোনা সম্বন্ধে আমি জানতে খুবই আগ্রহী । তবে সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খোঁজখবর সংগ্রহ করা যায় না বলে এই উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করা যায় না ।

ভাস্বতী দাস
পি. কে. গাঙ্গুলি রোড, হাওড়া

সম্পাদকীয় উত্তর : ১৬ নভেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যায় কেরিয়ার গাইড বিভাগে আমেরিকায় পড়াশোনার নিয়মকানুন এবং পরামর্শ প্রকাশিত হয়েছে ।

'টাকার জন্ম' উল্লেখযোগ্য সংযোজন

কুষাণ স্বর্ণ মুদ্রায় রাজা বিম কদফিসের প্রতিমূর্তি

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'টাকার জন্ম' পড়ে ভীষণ ভাল লাগল । নিঃসন্দেহে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-এর মতোই এই লেখাটিও একটি মহত্তম সংযোজন আনন্দমেলায় । আশা করব, মুদ্রার পর মূর্তিতত্ত্ব এবং লিপিতত্ত্ব নিয়ে এরকম আরও কিছু লেখা দেখতে পাব এই পত্রিকায় ।

বিধু চক্রবর্তী
দুর্লভপুর, বাঁকুড়া

বিজ্ঞান : গবেষণা

এখন অষ্টম গ্রহ প্লুটো

প্লুটো সম্বন্ধে নতুন কিছু তথ্য জানিয়েছেন
কল্যাণকুমার দে

পারসিভাল লাওয়েল জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক জটিল অঙ্ক নিয়ে বসেছেন। পাশের টেবিলে রাখা আছে তাঁর চিরসঙ্গী টেলিস্কোপ। কিন্তু অঙ্কটা কিছুতেই মিলছে না। কোথায় যেন একটা গরমিল থেকেই যাচ্ছে। সেই থেকে লাওয়েলের মনে সন্দেহ হল, নিশ্চয় নেপচুনের বাইরেও সৌরজগতের কোনও অনাবিষ্কৃত গ্রহ আছে, যার আকর্ষণ বল তাঁর গণনায় ধরা হয়নি। আর তার ফলেই এই গরমিল। এ সেই ১৯১৫ সালের কথা। অঙ্ক ছেড়ে লাওয়েল সেই গ্রহটিকে খুঁজতে শুরু করলেন। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থতায় তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৩০-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি উইলিয়ম টামবাউ নামে লাওয়েল মানমন্দিরের তরুণ এক সহকারী গবেষক হঠাৎ নতুন গ্রহটি আবিষ্কার করলেন। গ্রহটির নাম প্লুটো। কিছুকাল আগেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, প্লুটো আয়তনে অনেক বড়। অন্যান্য গ্রহের তুলনায় তার ঘনত্ব অনেক কম। সম্প্রতি পশ্চিম বার্লিনের টেকনিকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা কিন্তু অন্য কথা বলছেন। চিলির ইউরোপিয়ান সাদার্ন মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী মানফ্রেড পাকুল এবং ক্লস জরনশ্‌ক বলেছেন, প্লুটোর ব্যাস ২২০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ, গ্রহটির আয়তন চাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ। তাঁদের মতে, প্লুটোর আয়তন ইউরেনাসের বৃহত্তম দুটি উপগ্রহের সমান। এ ছাড়াও আর যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় এই গ্রহটি কোনও এক সময় সৌরজগতের কোনও একটি গ্রহের উপগ্রহ ছিল। সেই গ্রহটি সম্ভবত ইউরেনাস। ইউরেনাসের পরিমণ্ডল থেকে বিচ্যুত হয়ে সেটি তার বর্তমান পথে এসে হাজির হয় এবং গ্রহ হিসেবে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। ১৯৭৮ সালে প্লুটোর একমাত্র উপগ্রহ বা চাঁদ 'চ্যারন' (Charon) আবিষ্কৃত হয়। ১৯৮৮ সালে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়ম ম্যাকিনন এবং সাদার্ন মেথোডিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডালাস) স্টিভ মিউলার চ্যারনের জন্মরহস্য নিয়ে চাঞ্চল্যকর কথা বলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, প্রথম অবস্থায় প্লুটোর কোনও চাঁদ ছিল না। প্লুটো তখন

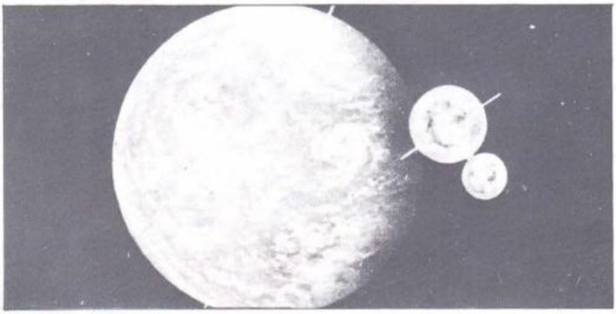

প্লুটো ও তার চাঁদ চ্যারন

প্লুটোর সঞ্চারপথ-পরিক্রমণপথ

একটা আস্ত গ্রহ হিসেবে নিজের কক্ষপথে একা-একাই ঘুরত। সেই সময় মহাকাশের এক আগন্তুক বিশাল বস্তু প্লুটোকে জোরে ধাক্কা মেরে চলে যায়। সেই ধাক্কায় প্লুটো অসমানভাবে দু' টুকরো হয়ে যায়। বড় টুকরো হল বর্তমানের প্লুটো গ্রহ এবং ছোট টুকরোটা হল চ্যারন। চ্যারনের আয়তন প্লুটোর অর্ধেক। তাই অনেক সময় মনে করা হয় প্লুটো যুগ্ম গ্রহ।
সম্প্রতি ডেভিড থেলেন এবং মার্ক বুই প্লুটো ও চ্যারনের একত্রে ঘনত্ব নির্ণয় করেছেন। এদের ঘনত্বের মধ্যে তাঁরা কোনও তফাত খুঁজে পেলেন না। প্রতি ঘনমিটারে এদের ঘনত্ব হল ১৯৯০ কিলোগ্রামের মতো। অর্থাৎ, জলের ঘনত্বের ১·৯৯ গুণ। প্লুটো যদি অন্য কোনও গ্রহের বিচ্যুত উপগ্রহ হত, তা হলে কোনও-না-কোনও গ্রহের ঘনত্বের সঙ্গে মিল থাকত। কিন্তু প্লুটোর ক্ষেত্রে সে কথা বলা যাবে না। সুতরাং বিজ্ঞানীদের ধারণা হল, সম্ভবত প্লুটো বড় কোনও পাথুরে জ্যোতির্পিণ্ড বা অ্যাসটেরয়েড পরিবারের সদস্য। মজার কথা, সেই জ্যোতির্পিণ্ড পরিবারটি কিন্তু আমাদের সৌরজগতের বাইরে। প্লুটোর অনেক কিছুই অবাক করার মতো। যেমন, তার সঞ্চারপথ। সৌরজগতে প্লুটোর কক্ষপথ সবচেয়ে বেশি উপবৃত্তাকার। এই কক্ষপথে প্লুটো সূর্যের কাছে এলে দূরত্ব দাঁড়ায় ২৭৪ কোটি মাইল। আবার দূরে চলে গেলে এই ব্যবধান হয় ৪৫৭ কোটি মাইল। কখনও-কখনও প্লুটো নেপচুনের কক্ষপথ ভেদ করে চলে যায়, তখন নেপচুন হয় নবম গ্রহ। ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্লুটো এখন অষ্টম গ্রহ। তারপর প্লুটো হবে যথারীতি সেই দূরতম নবম গ্রহ।
এই গ্রহটির দুই মেরু বরফে ঢাকা। আর সে-বরফ ঘনীভূত মিথেন। নিরক্ষীয় অঞ্চল বরফমুক্ত। সৌর জগতের আর কোনও অন্তর্বর্তী গ্রহে এত বরফ পাওয়া যায় না। এইজন্যই প্লুটোকে 'শীতলতম গ্রহ' বলা হয়। এই গ্রহটির তাপমাত্রা প্রায় -২০০° সেলসিয়াস থেকে -৩০০° সেলসিয়াসের মতো। ১৯৮৫ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্লুটোর গ্রহণ দেখতে পেয়েছেন।

চিত্রণ : নীলরতন মাইতি

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

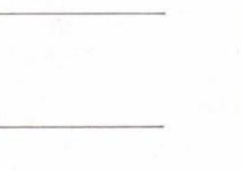

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

সাগরপারের পাখি

দক্ষিণ জর্জিয়া যেন প্রকৃতির সাজঘর। এখানে দেখা যায় নানারকম সামুদ্রিক প্রাণী ও পাখির সমাবেশ। এই দ্বীপটির কথা জানিয়েছেন পুষ্পেন্দু বিশ্বাস

দক্ষিণ জর্জিয়া। অতলান্তিকের বুকে ঠিক যেন নির্মল এক ঝলক আলো। একশো ছ' মাইল দীর্ঘ এই দ্বীপটি যেন প্রকৃতির সাজঘর। ১৭৭৫ সালে এই দ্বীপটির কথা বিশ্ববাসীর কাছে সর্বপ্রথম তুলে ধরেন ক্যাপ্টেন জেমস কুক। বর্তমানে পৃথিবীর নানা প্রান্তে এই দ্বীপটির নাম ছড়িয়ে পড়েছে প্রধানত দুটি কারণে। এক, এই দ্বীপটির অধিকার নিয়ে ১৯৮২ সাল থেকেই আর্জেন্টিনার সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের একটা রেষারেষি শুরু হয়েছে। ১৭৭৫ সালে দ্বীপটির আবিষ্কারের সময় ক্যাপ্টেন কুক এর ওপর গ্রেট ব্রিটেনের আধিপত্যের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। আজও গ্রেট ব্রিটেন-ই দক্ষিণ জর্জিয়ার রক্ষক, তবে আন্তর্জাতিক স্তরে অনেক বিবাদ-বিতর্কের মধ্য দিয়ে। দুই, এই দ্বীপটি হল নানারকম সামুদ্রিক প্রাণী ও

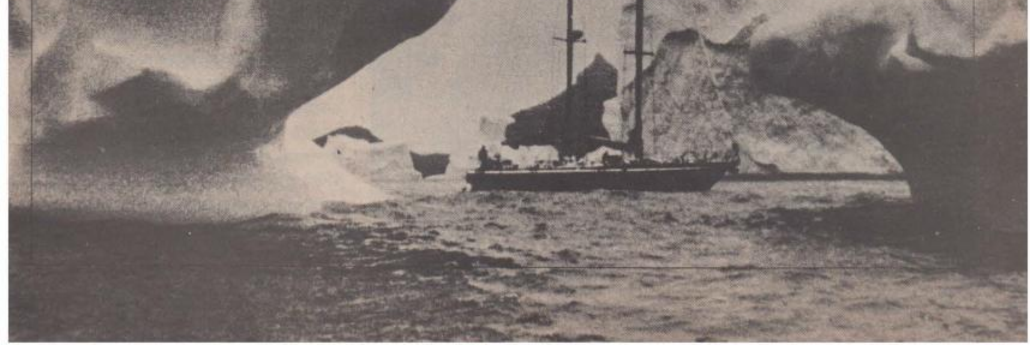

বরফ পাহাড়ের অলিগলি পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে শেলি পনসেটের ইয়ট। (ইনসেট) পেঙ্গুইন ও তার ডিম নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা

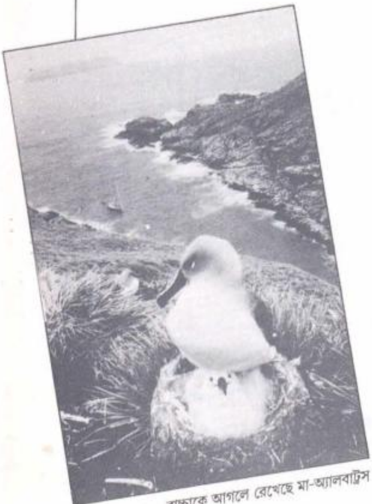

বাচ্চাকে আগলে রেখেছে মা-অ্যালবাট্রস

বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক পাখির বিচরণভূমি।

দক্ষিণ জর্জিয়ায় তিমি, সিল ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর প্রাচুর্যের কথা জেমস কুকের আবিষ্কারের কিছুদিনের মধ্যেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। গত দুশো বছর ধরে মানুষের হাতে অস্বাভাবিক অবস্থায় অসংখ্য প্রাণীর অবলুপ্তি ঘটেছে, আজও ঘটছে। দক্ষিণ জর্জিয়ার ক্ষেত্রেও এই দুঃখজনক ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটেনি। দক্ষিণ জর্জিয়ার একপ্রান্ত 'লি-ইথ হারবার'-এ ১৯০৪ সালে তিমি শিকারের ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। ফলে তিমি ও সিলের সংখ্যা দক্ষিণ জর্জিয়ায় খুব কমে গেল। শুধু তাই নয়, মানুষের কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজকর্মের ফলে এক বিশেষ প্রজাতির সামুদ্রিক পাখির অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। লি-ইথ হারবার-এর তিমি-শিকার কেন্দ্র আইন করে বন্ধ করে দেওয়ার পর ধীরে-ধীরে ফার সিল-এর সংখ্যা কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে বটে, কিন্তু সেই তুলনায় তিমির সংখ্যা মোটেই বাড়েনি। আর সেই বিশেষ প্রজাতির সামুদ্রিক পাখিটিকে আজ দক্ষিণ জর্জিয়ায় বিজ্ঞানী ও গবেষকরা কালে-ভদ্রে দেখতে পান।

শিশুটি অবাক হয়ে দেখছে কিং পেঙ্গুইনের মিছিল

বর্তমানে দক্ষিণ জর্জিয়ায় পেট্রল, আলবাট্রস ও করমোরান্টস—প্রধানত এই তিন ধরনের সামুদ্রিক পাখি দেখা যায়। এ ছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির সিল ও পেঙ্গুইন। ব্রিটিশ আন্টার্কটিক সার্ভে (বি এ এস)-এর এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় যেসব তথ্য জানা যায় তা মোটামুটি এইরকম : এক লক্ষ ফার সিল, প্রায় চার লক্ষ এলিফ্যান্ট সিল, দু' লক্ষেরও বেশি কিং পেঙ্গুইন, ছ' লক্ষেরও বেশি ম্যাকারনি পেঙ্গুইন, প্রায় দশ হাজার মলিম্যাক আলবাট্রস ও লক্ষাধিক খুব ছোট পেট্রল দক্ষিণ জর্জিয়ার বাসিন্দা। সিল প্রজাতির মধ্যে এলিফ্যান্ট সিল-ই সবচেয়ে দীর্ঘকায়। কোনও-কোনও এলিফ্যান্ট সিল দৈর্ঘ্যে পঁচিশ ফুট ও ওজনে চার টন পর্যন্ত হতে পারে। এখানকার ওয়ান্ডারিং আলবাট্রস ও রয়াল আলবাট্রস-ই হল পৃথিবীর দীর্ঘতম সি-বার্ড। দক্ষিণ জর্জিয়ার বার্ড আইল্যান্ড ও আইলস উপসাগর হল এদের অবাধ বিচরণভূমি। পৃথিবীতে বসবাসকারী সতেরো রকমের বিভিন্ন প্রজাতির পেঙ্গুইনের মধ্যে আকারে দ্বিতীয় বৃহত্তম হল কিং পেঙ্গুইন। এম্পারার পেঙ্গুইনদের পরেই এদের স্থান। দক্ষিণ জর্জিয়ার সেন্ট অ্যান্ড্রুজ উপসাগরের কাছে গড়ে উঠেছে এদের বৃহত্তম কলোনি, যেখানে প্রায় চল্লিশ হাজার কিং পেঙ্গুইনের

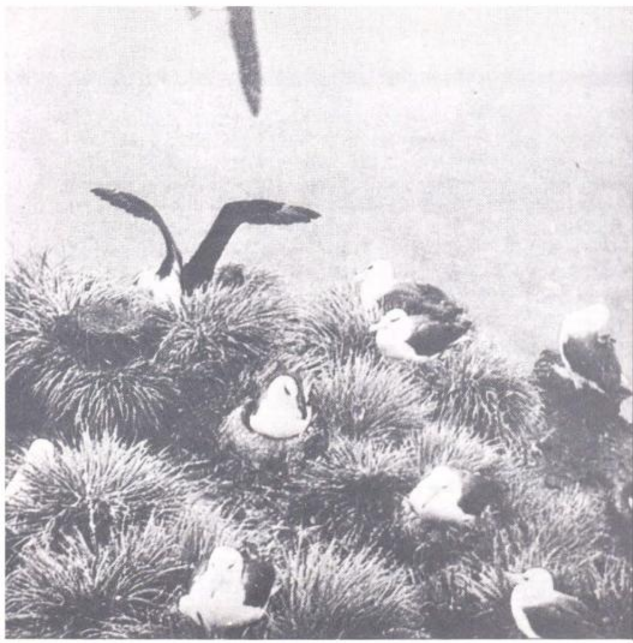

দক্ষিণ অতলান্তিকের পক্ষিবিশেষজ্ঞ পিটার প্রিন্স পাখিদের আস্তানায়— পাখিরা তাঁকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে

অজানা দ্বীপের পরিবেশে শিশুরা পেয়েছে নতুন বন্ধু

সন্ধান পাওয়া গেছে। কিং পেঙ্গুইনদের সর্বোচ্চ ওজন চল্লিশ পাউন্ড ও সর্বাধিক উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। সমুদ্রে এদের গতিবেগ হল প্রতি ঘণ্টায় প্রায় কুড়ি মাইল। এমনকী, খাদ্যের সন্ধানে এরা সমুদ্রের গভীরে প্রায় হাজার ফুট পর্যন্ত যেতে পারে।

দক্ষিণ জর্জিয়া ও তার জীবজগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালানোর ইচ্ছা নিয়ে সেখানে প্রথম যান স্বনামধন্য মার্কিন প্রকৃতিবিশারদ রবার্ট কাশম্যান মারফি। ব্রুকলিন মিউজিয়াম ও আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রির যৌথ উদ্যোগে মারফি ১৯১২ সালে দক্ষিণ জর্জিয়ার 'কেপ রোসা'-য় অবতরণ করেন। তিনি যে জলযানটিতে চেপে আসেন তার নাম ছিল 'ডেইসি'। দক্ষিণ জর্জিয়ার প্রাণী ও উদ্ভিদ সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন মারফি। এইসব সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর করেই পরবর্তীকালে শুরু হয় ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান।

ব্রিটিশ আন্টার্কটিক সার্ভের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ, ধীরে-ধীরে প্রকাশিত হয় দক্ষিণ জর্জিয়া সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য। ওই সংস্থার পক্ষ থেকে এ-কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন পিটার প্রিন্স, কালান ডাক ও মিক জোন্স। আজ থেকে প্রায় দু' দশক আগে ১৯৭১ সালে বার্ড আইল্যান্ড-এর জন্মলগ্ন থেকেই পিটার প্রিন্স এর অধিকর্তা। দক্ষিণ মেরুর পাখিদের পরিবেশ সম্বন্ধে তিনি বর্তমানে পৃথিবীর সেরা বিশেষজ্ঞদের অন্যতম।

প্রসঙ্গত অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় পনসেট-দম্পতির কথা। জেরম পনসেট ও শেলি পনসেট আজ থেকে এগারো বছর আগে সর্বপ্রথম সাউথ জর্জিয়ার বার্ড আইল্যান্ডে আসেন। এর পর তাঁরা দক্ষিণ জর্জিয়ায় বারবার এসেছেন। পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত তাঁদের জলযানটির নাম হল 'ডেমিয়েন-টু'। ১৯৮৫ সালে বি এ এস-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে সাউথ জর্জিয়ায় সি-বার্ড সার্ভের একটি বিশেষ প্রকল্প তাঁরা শুরু করেছেন।

আর্জেন্টিনার গতিবিধির ওপর নজরদারি করার জন্য দক্ষিণ জর্জিয়ার 'গ্রাইটভাইকেন'-এ ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজের সমাবেশ ঘটেছে। দক্ষিণ জর্জিয়াকে ঘিরে নানা দেশের ভ্রমণপিপাসু প্রকৃতিপ্রেমিকদের উৎসাহ ও আকর্ষণ বাড়ছে। সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে বছরে কয়েকশো মানুষ কয়েক ঘণ্টার জন্য দক্ষিণ জর্জিয়ায় বেড়াতে যান। এঁদের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে।

ফোটো : 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এর সৌজন্যে

তিন সপ্তাহ বয়সের একটি অ্যালবাট্রসের ওজন পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ওর ওজন দেড় কিলোগ্রাম। পক্ষিবিজ্ঞানীরা পাখিদের বিষয়ে গবেষণার জন্য ওদের খুঁটিনাটি সব বিবরণই লিখে রাখেন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় গোবর থেকে বিদ্যুৎ

ক্যালিফোর্নিয়ার 'মেসকোয়াইট লেক রিসোর্স রিকভারি প্রোজেক্ট' গোবরকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মিল ভ্যালি-র ন্যাশনাল এনার্জি অ্যাসোসিয়েটস। এই বিদ্যুৎ-কেন্দ্রটিতে প্রতিদিন আটশো টন গোবর ব্যবহার করা হচ্ছে। কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে গোবর পাঠিয়ে দেওয়া হয় চুল্লিতে। চুল্লিতে গোবর জ্বালিয়ে যে-তাপ উৎপন্ন হয় তা একটি বয়লারের জলকে উত্তপ্ত করে বাষ্পে পরিণত করে। প্রতি ঘণ্টায় উৎপন্ন হয় দেড় লক্ষ পাউন্ড বাষ্প টারবাইন ও তার সঙ্গে যুক্ত জেনারেটরকে ঘোরায়।

পুরনো বৈদ্যুতিক বাতিতে নতুন ম্যাজিক

অভিনব এই জাদুকরের নাম 'টাচট্রনিক ডিমার'। যে-কোনও টেবিল-ল্যাম্প অথবা শৌখিন বাতির বাল্‌বটি খুলে নিন। তারপর বাল্‌ব সকেটে লাগিয়ে দিন টাচট্রনিক ডিমার। এর ওপরেই রয়েছে বাল্‌ব লাগানোর সকেটের বন্দোবস্ত। ফলে কোনওরকম ওয়্যারিং-এর ঝঞ্ঝাট ছাড়াই টাচট্রনিক ডিমার লাগিয়ে তার ওপরে পুরনো বাল্‌বটি লাগিয়ে নেওয়া যাবে। শুধু বাল্‌বটা আগের চেয়ে সামান্য উঁচু হয়ে থাকবে। ব্যস, এর পরই শুরু হবে টাচট্রনিক ডিমারের ম্যাজিক।
টেবিল-ল্যাম্পের যে-কোনও ধাতব অংশ স্পর্শ করলেই হয়ে যাবে সুইচের কাজ। একবার স্পর্শ করলে পাওয়া যাবে নাইট-ল্যাম্পের মতো টিমটিমে আলো। দ্বিতীয়বার ছুঁলেই সেই আলো আরও খানিকটা জোরালো হয়ে উঠবে। আর তিনবারের ছোঁওয়ায় পাওয়া যাবে পুরো ক্ষমতার আলো। ধাতব স্ট্যাণ্ড লাগানো বাতির ক্ষেত্রে টাচট্রনিক ডিমার ব্যবহার করা সবচেয়ে সুবিধেজনক। কারণ স্ট্যাণ্ডের যে-কোনও জায়গা স্পর্শ করলেই সুইচের কাজ পাওয়া যাবে। সুতরাং মাঝরাতে ঘুম

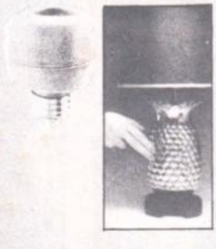

ভাঙলে বিছানার পাশে রাখা টেবিল-ল্যাম্পের সুইচ হাতড়ানোর ঝামেলা থেকে রেহাই দেবে টাচট্রনিক ডিমার। এর সাহায্যে অল্প খরচে একই বাল্‌ব থেকে পাওয়া যাবে তিন-তিনরকম বৈদ্যুতিক ক্ষমতার আলো। টাচট্রনিক ডিমারের দাম প্রায় ষোলো ডলার। সঙ্গে রয়েছে এক বছরের গ্যারান্টি।

কুকুরের আক্রমণ থেকে বাঁচাবে আলট্রাসনিক্স

নাম 'ডেজার'। দাম মাত্র তিরিশ ডলার। তবে কর্মদক্ষতা অভিনব। লক্ষ করে দেখা গেছে, কিছু-কিছু কুকুর আছে যারা মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন নয়। কোনও কট্টর সারমেয়প্রেমীও অনেক সময় এ-ধরনের তিরিক্ষি-মেজাজি কুকুরের পাল্লায় পড়ে যেতে পারেন। তখন সেই 'অভদ্র' কুকুরের হাত থেকে বাঁচাবে ডেজার। এর বোতাম টিপলেই নির্গত হবে শব্দোত্তর তরঙ্গের স্রোত। উচ্চ কম্পাঙ্কের এই শব্দ মানুষ শুনতে পাবে না। কিন্তু কুকুরের শ্রবণ ক্ষমতা মানুষের চেয়ে বেশি। তাই এই শব্দ সে শুনতে পাবে। তবে এই শব্দে কুকুর আঁতকে উঠলেও তার ক্ষতি হওয়ার কোনও ভয় নেই।
ডেজার -এর মাপ মাত্র পৌনে পাঁচ ইঞ্চি। প্লাস্টিক কেসে ভরা এই যন্ত্রটি বেল্টের সঙ্গে লাগিয়ে নেবার বন্দোবস্ত আছে। যন্ত্রটি কাজ করে একটি মাত্র ৯ ভোল্ট ব্যাটারির সাহায্যে। এই যন্ত্র সকলেরই কাজে লাগবে, তবে সবচেয়ে বেশি যার কাজে লাগতে পারে, সে হল ডাকপিয়ন।

খুনি মৌমাছিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে

খুনি মৌমাছিরা এবারে যখন আমেরিকায় হাজির হবে তখন ওক রিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিজ-এর প্রযুক্তিবিদেরা তাদের জন্য তৈরি থাকবেন। তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র বলতে আধ ক্যারাট হিরের মাপের সৌরশক্তিচালিত একটি সিলিকন মাইক্রোচিপ, আর তার সঙ্গে অপস্বর বিশ্লেষণের আধুনিক যন্ত্র। সাধারণ মৌমাছি আর খুনি মৌমাছির শব্দের তফাত ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বিচার করে প্রযুক্তিবিদেরা চিনে নেবেন খুনি মৌমাছিকে।
কয়েকটি খুনি মৌমাছি পাকড়াও করে তাদের পিঠে এই খুদে মাইক্রোচিপ আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এই

'ইলেকট্রনিক' মৌমাছিগুলো তাদের জাত চিনিয়ে দেবার ব্যাপারে গুপ্তচরের কাজ করে। খুনি মৌমাছি নির্মূল করার জন্য গবেষকরা তাদের জীবন-যাপনের প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখছেন। এটা সম্ভব হচ্ছে মাইক্রোট্রান্সমিটারের সংকেত অনুসরণ করার ফলে। এ ছাড়া ওক রিজের প্রযুক্তিবিদেরা আমেরিকার মৌমাছি-পালন কেন্দ্রের মালিকদের একটি করে নতুন শব্দ-সন্ধানী যন্ত্র দিয়ে সাহায্য করছেন। নিউক্লীয় বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে এই যন্ত্র প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল। নিউক্লীয় রিঅ্যাক্টরে কোনও গোলমাল দেখা দিলে শব্দের যে সূক্ষ্ম তারতম্য হয় তার সংকেত পাওয়ামাত্রই কর্মীদের সাবধান করে দেওয়াই ছিল এই যন্ত্রের কাজ। এই যন্ত্রকেই সামান্য উন্নত করে মৌমাছি-পালন কেন্দ্রের মৌচাকে হানা দেওয়া খুনি মৌমাছি চিনে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পিঠের ব্যথা কমাতে অভিনব ব্যবস্থা

দেখতে খুব নরম গদি আঁটা সুদৃশ্য সোফা। যেন আরাম করে বসার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অথচ পিঠের ব্যথায় ভুগছেন এমন রুগির পক্ষে এই আরামদায়ক সোফাই হয়ে উঠতে পারে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক। ঠিক একই রকম অসুবিধেজনক হতে পারে অফিসের চেয়ার, গাড়ির গদি-মোড়া সিট, প্লেন বা ট্রেনের যাত্রী-আসন। সুতরাং এগুলো ব্যবহার করার সময় মনে হতেই পারে চেয়ারের পিঠটা কেন সবসময় ব্যথার জায়গাটাকেই আঘাত করছে। এই সমস্যার সমাধানে নতুন চালু হয়েছে অভিনব হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা।
অস্থিবিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসকদের পরামর্শে তৈরি এই ব্যবস্থার মূল রহস্য একটি রোলার বার ; এই বারটিকে খুব সহজে ন'টি বিভিন্ন উচ্চতায় আটকানো যায়। বারটির সাহায্যে ভেতরের পাঁচটি খাড়া ইস্পাতের পাতের বক্রতা পরিবর্তন করা হয়। ফলে এর মধ্যে কোন উচ্চতাটি ব্যবহারকারীর পিঠের পক্ষে সবচেয়ে আরামদায়ক সেটা তিনি নিজেই ঠিক করে নিতে পারবেন। এ ছাড়া বাড়তি আরাম দিতে ইস্পাতের ওপরে রয়েছে ফোমের গদি, টেকসই প্লাস্টিকের ফ্রেম, আর ময়লা হলে কাচা যায় এমন ঢাকনা। রোলার বারকে ঠিক জায়গায় বসানোর জন্য একপাশের চেন খুললেই হল—হাতের কাছেই পাওয়া যাবে অ্যাডজাস্টমেন্টের চাকতি। এ ছাড়া চেয়ারের সঙ্গে লাগানোর জন্য ভেলক্রো ফিতের ব্যবস্থাও রয়েছে। দাম মাত্র পঁয়ত্রিশ ডলার।

ভিডিও ওয়াকম্যান

সনি কর্পোরেশনের নতুন ভিডিও ওয়াকম্যান হাতের কাছে পেলে নিজের প্রিয় ভি সি আরটিকে ভুলে যেতে বেশি সময় লাগবে না। বড় মাপের ভি সি আর-এর যা-যা ক্ষমতা তার সবই আছে এই খুদে ভিডিও ওয়াকম্যানের। টিভি প্রোগ্রাম খুশিমতো রেকর্ড করে যখন খুশি চালিয়ে দেখা যায়। অথবা প্রমাণ মাপের ভিডিও ক্যাসেট চালিয়ে পছন্দসই সিনেমাও দেখা যেতে পারে। এর লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে রঙিন পরদার মাপ চার ইঞ্চি। এই খুদে ভি সি আর সঙ্গে নিয়ে যেখানে-সেখানে যাওয়া যেতে পারে।

যন্ত্রমানব 'ড্রয়েড জেনেসিস-ওয়ান'

নিউ ইয়র্কের ড্রয়েড সিস্টেমস তৈরি করেছেন এই যন্ত্র-ভৃত্য। কী কী করতে পারে এই রোবট ? অনেক-কিছুই। যেমন, গ্লাসে পানীয় ঢেলে দেওয়া, তাক গোছানো, কুকুর বেড়ানো, ইমনকী, নিরাপত্তা রক্ষীর কাজও। বহু 'কাজের কাজি' এই ক্ষুদ্র যন্ত্র-ভৃত্যের দাম সাড়ে বারো হাজার ডলার। মনে হতে পারে, কাজগুলো আর এমন কী কঠিন! কিন্তু এ-কথা ঠিক, কঠিন না হলেও খুব যে সহজ তা-ও নয়। যেমন, গ্লাসে পানীয় ঢালতে গেলে

রোবটের আঙুলে চাপের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখতে হয়। নইলে তার ধাতব আঙুল বাড়তি চাপ দিয়ে গ্লাস ভেঙে ফেলতে পারে। আমরা যখন কোনও হালকা জিনিস ধরি তখন আঙুলে অল্প চাপ দিই। আবার ভারী জিনিস ধরার সময় অপেক্ষাকৃত জোরে চাপ প্রয়োগ করি। এই ধরনের চাপ নিয়ন্ত্রণের কাজ খুবই কঠিন। আমাদের ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় মস্তিষ্কের বাহাদুরির জন্য। রোবটের ক্ষেত্রে 'ট্যাকটাইল ফিডব্যাক'-এর সাহায্যে এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা রাখা হয়। সুতরাং এটা বোঝা গেল, যে-কাজ আমাদের পক্ষে খুব সহজ, সেই একই কাজ রোবটকে দিয়ে করানোর ব্যাপারটা বেশ জটিল। এই জটিল কাজকেই সম্ভব করে তুলেছে উন্নত ইলেকট্রনিক্স।

তিনটে মাইক্রোপ্রসেসর, কিছু আই সি চিপ। এরাই ঘটাল আজব কাণ্ড

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ

জেট-যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ আগের চেয়ে এখন আরও বেশি করে পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসেছে। বেড়েছে পরস্পরের ভাষা ও সংস্কৃতির খোঁজখবর নেওয়ার প্রবণতা। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। এক ভাষার মানুষকে অন্য ভাষা শিখতে হবে। বিশেষ করে, কেউ যদি ভিন্ন ভাষার লেখা নিজের ভাষায় অনুবাদ করতে চান, তা হলে তাঁকে সেই ভাষা শিখতে হবে বেশ ভালভাবে। এর জন্য যথেষ্ট সময় দরকার। কিন্তু হঠাৎ কোনও প্রয়োজন পড়লে সমস্যা-সমাধানের কি কোনও উপায় আছে ? জরুরি ভিত্তিতে কি কিছু করা যায় ? আশার কথা, বিদেশ থেকে সুখবর পাওয়া গেছে। যাবে না-ই বা কেন ?

আজকের যুগ ইলেকট্রনিক্সের যুগ। কী না পারে ইলেকট্রনিক্স। যেমন তিনটে মাইক্রোপ্রসেসর আর কিছু আই সি চিপ মিলে তৈরি হয়েছে 'আজব রকম কল'—'ভয়েস'। উন্নত ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে ভয়েস এক ভাষায় কথা 'শুনে' তা অন্য আর একটি ভাষায় অনুবাদ করে শুনিয়ে দিতে পারে, আর দরকার হলে তা ছাপিয়ে পর্যন্ত দিতে পারে। দুটি ভাষা নয়, ভয়েস তিন-তিনরকম ভাষা নিয়ে এরকম 'দোভাষীর' কাজ করতে পারে। যন্ত্রটি মাপে এত ছোট যে, যেখানে-সেখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এর মাপ হল : আট ইঞ্চি লম্বা, সাত ইঞ্চি চওড়া, আর তিন ইঞ্চি পুরু। ওজন দেড় কিলোগ্রামেরও কম। যন্ত্রটি বাজারে ছেড়েছে আমেরিকার অ্যাডভান্সড প্রোডাক্টস টেকনোলজিস। দাম ২০০০ ডলার।

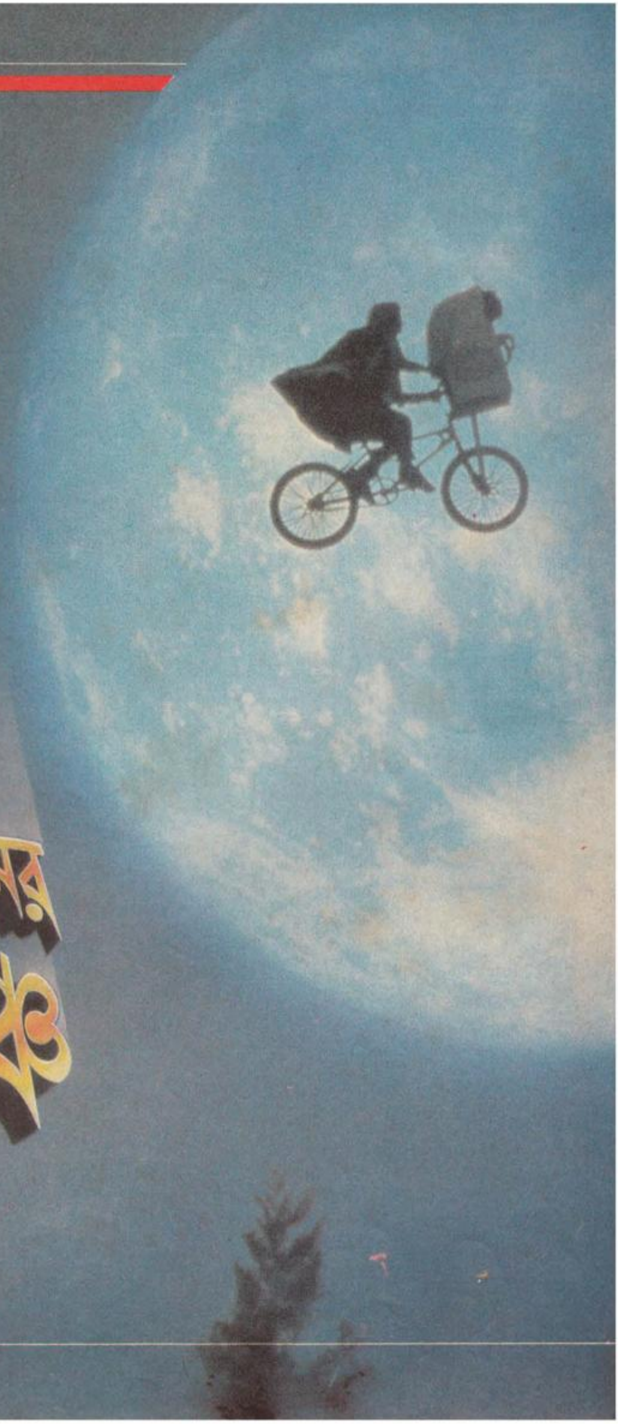

কল্পবিজ্ঞান-সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের বিশেষ একটা আকর্ষণ আছে। আজকের দিনে বিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান ও চলচ্চিত্রের মধ্যে গড়ে উঠেছে ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী পড়তে যেমন ভাল লাগে, তেমনই চলচ্চিত্রে সেই কাহিনীর অদ্ভুত সব ঘটনা দেখার মধ্যেও আছে দারুণ রোমাঞ্চ। বাস্তবের সঙ্গে সেখানে মিশে যায় কল্পনা। সব মিলে এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। লিখেছেন

গৌতম চক্রবর্তী

কল্পবিজ্ঞানের রোমাঞ্চ

রোমাঞ্চকর গল্প বলে মনে হলেও ষোলো আনা সত্যি। ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাস। প্যারিস শহরে লুমিনের পদবিধারী দুই ভাই এক মজার খেলা দেখাচ্ছিলেন।
এই মজার খেলার নাম সিনেমা।
মাত্র সাত বছর আগে, ১৮৮৮ সালে জর্জ ইস্টম্যান সেলুলয়েডের ফিল্ম আবিষ্কার করেছেন, এডিসনের দৌলতে আরও আগে কিনেটোস্কোপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রোজেক্টর মেশিনে সেলুলয়েডের ফিল্মে তোলা ছবি রোল করে জড়িয়ে সাদা পরদা ফেললে কিছু চলন্ত ছবি দেখা যায়। লুমিনের ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের এই ভোজবাজির খেলা দেখার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা করেছিলেন। টিকিট কেটে চলন্ত ছবি দেখার এই ব্যাপারটাকে তাঁরা আখ্যা দিয়েছিলেন 'সিনেমা'।
ওই ১৮৯৫ সালে জার্মানিতে এক তরুণ

ই. টি. : শূন্যে সাইকেল নিয়ে ওড়ার আগের মুহূর্ত

ক্লোজ এনকাউন্টারস অব দ্য থার্ড কাইন্ড

চিকিৎসক তাঁর প্রথম বই প্রকাশ করেছিলেন। বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিল সেই বই। চিকিৎসকের নাম সিগমণ্ড ফ্রয়েড।
১৮৯৫ সালের ফ্রান্সে তখনও বেঁচে আছেন জুলে ভার্ন। আর ইংল্যাণ্ডে ত্রিশ বছরের এক অসুস্থ, ভগ্নস্বাস্থ্য যুবক হাজির হয়েছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস নিয়ে। উপন্যাসটির নাম 'দ্য টাইমমেশিন'। যুবকটির পুরো নাম হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস। এইচ জি ওয়েলস নামেই তিনি এই উপন্যাসটি লিখেছেন।
বিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান আর সিনেমা এইভাবে

তেইশ শতকের পটভূমিকায় তৈরি 'স্টার ট্রেক'

'সুপারম্যান-টু'

ভিনগ্রহী প্রাণীর সঙ্গে এলিয়ট

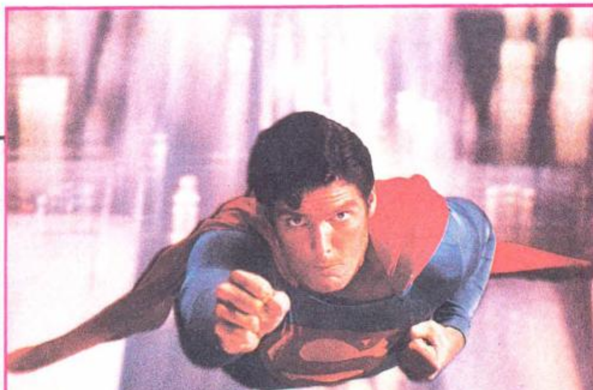

নানা চমকে ভরা 'সুপারম্যান'

শুরু থেকেই একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। এদের সূচনাপর্ব একই—১৮৯৫।

আজ আর জুলে ভার্ন বা এইচ জি ওয়েলসের হেন কাহিনী নেই যা না একাধিকবার চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। বস্তুত, ১৮৯৫ সালের পর আজ একশো বছরও পার হয়নি, কিন্তু কল্পবিজ্ঞান ইতিমধ্যেই রুপোলি পরদায় প্রবলভাবে তার নিজের জায়গা অধিকার করে নিয়েছে। সিনেমার ইতিহাস

স্পেশাল এফেক্ট

শিল্প এবং বিজ্ঞান যে মাধ্যমটিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তার নাম সিনেমা। কল্পবিজ্ঞানের ছবি করতে গেলে ছবিতে থাকা দরকার দুর্দান্ত 'সেট' আর ক্যামেরার অসাধারণ কারসাজি, অর্থাৎ 'স্পেশাল এফেক্ট'। স্পেশাল এফেক্টকে শুধুমাত্র কল্পবিজ্ঞানেরবির পরিচালকরাই কাজে লাগাননি, কাজে লাগিয়েছেন অন্যান্য পরিচালকরাও। 'থিফ অব বাগদাদ' ছবিতে বাগদাদ নগরীর ওপর দিয়ে পক্ষিরাজে করে

লিখতে বসলে 'বেন হুর', 'সাউণ্ড অব মিউজিক' বা 'টেন কম্যাণ্ডমেন্টস'-এর মতো ক্লাসিক ছবিকে যেমন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেরকম এড়িয়ে যাওয়া যাবে না 'স্টার ওয়রস', 'ই টি', 'ক্লোজ এনকাউন্টারস অব দ্য থার্ড কাইণ্ড' বা 'টুয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগস আণ্ডার দ্য সি'-কে। এইসব সায়েন্স ফিকশন মৌলিকত্বের গুণে আজ ক্লাসিক বা মহাকাব্যের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে বসলেও আজ আর কোনওমতে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না আইজ্যাক আসিমভ বা আর্থার সি ক্লার্ক-এর নাম। স্পিলবার্গ বা কুপারের কথা ছেড়ে দিলাম, ত্রুফো, গদার বা তারকোভস্কির মতো পৃথিবীবিখ্যাত পরিচালককে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছে 'সায়েন্স ফিকশন' নামের নবতম ব্যাপারটি। গদারের ছবি 'আলফাভিল, ইউনে এট্রেনজ ডি লেমি কশন' ছবিতে আলফাভিল ভবিষ্যতের এক নগরী। এই শহর কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, শহরের বাসিন্দা অধ্যাপক ভন ব্রাউনের কন্যা নাতাশাও মানুষ নয়, সে আসলে একটি রোবট বা যন্ত্রমানব। ওয়াল্ট ডিজনি প্রোডাকশন, মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ার, কলম্বিয়া, টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স···· ওয়েলসের এই ফিল্ম-প্রযোজক

'সেভেন ফেসেস অব ডঃ লাও', যেন রে ব্র্যাডবেরির গল্পের জগৎ

কম্পানিগুলিও সায়েন্স ফিকশন থেকে চোখ এড়িয়ে সরে যেতে পারেনি। ওয়াল্ট ডিজনি প্রোডাকশন যেমন প্রযোজনা করেছে টুয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগস আণ্ডার দ্য সি, টুয়েন্টিয়েথ

কবিতা, নাটক, উপন্যাস···সাহিত্যের এইসব সমৃদ্ধ শাখার পাশে সায়েন্স ফিকশন নিতান্ত অল্পবয়সী। কিন্তু আজ আর সায়েন্স ফিকশনকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

সেঞ্চুরি ফক্সের ব্যানারে, সেরকমভাবে পরদায় এসেছে স্টার ওয়রস, ইউনিভারসাল নিবেদন করেছে ই.টি.। জেমস মেসন, জেন ফণ্ডা, আলেক গিনেস, রেক্স হ্যারিসন, কার্ক ডগলাস, গ্রেগরি পেক, শন কোনারি, এইসব বিখ্যাত চিত্রতারকার মধ্যে মিল কোথায়? মিল একটিই। এঁরা প্রত্যেকেই কোনও-না-কোনও সায়েন্স ফিকশন ছবিতে অভিনয় করেছেন। ক্যাপ্টেন নিমো বলতেই এখন আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠেন দাড়িওয়ালা জেমস ম্যাসন, আলেক গিনেসের অভিনয়-প্রতিভার কথা ভাবলে

ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের উড়ে যাওয়া, সিসিল ডি মেলোর 'টেন কম্যান্ডমেন্টস' ছবিতে মোজেসের আদেশে সমুদ্রের দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়া রে হ্যারিহসেনের 'ক্ল্যাশ অব দ্য টাইটান্‌স' ছবিতে মেডুমা ও পারসিয়ুসের যুদ্ধ, 'স্টার ওয়রস' বা 'ক্লোজ এনকাউন্টারস অব দ্য থার্ড কাইন্ড' ছবির ভিনগ্রহী জীব ও ফ্লাইং সসার··ইত্যাদি সব হতভম্ব করে দেওয়া কাণ্ডকারখানা সম্ভব হয়েছে স্পেশাল এফেক্টের জোরে।

জর্জ মেলিসের ক্যামেরার লেন্স জ্যাম করে স্পেশাল এফেক্টের দৃশ্য আজ নিতান্ত শিশুর কাণ্ড বলে মনে হয়। সিনেমার প্রথম যুগে স্পেশাল এফেক্টের জাদুকর ছিলেন উইলিস ও ব্রায়ান। তিনি প্রাগৈতিহাসিক নানা জন্তুর মডেল করে ক্যামেরায় তাদের নড়াচড়া দেখাতেন। সিনেমার ক্যামেরায় ছবি তোলা হয় ফ্রেম ভাগ করে, সাধারণত একটি রোলে ২৪টি ফ্রেম থাকে। ধরা যাক, একটি ডাইনোসরের মডেল তার মাথা ৯০° কোণে ঘোরাবে, অর্থাৎ প্রতি ফ্রেমে তার মাথা ঘুরবে প্রায় ৩½° করে। একটি ফ্রেমে ৩½° কোণে মডেলের মাথা ঘুরিয়ে ক্যামেরা বন্ধ করা হয়। আবার ৩½° কোণে মাথা ঘুরিয়ে ছবি তোলা হয়। এইভাবে ২৪ বার করে শটগুলি পরপর সাজালে দেখা যাবে সেই প্রাগৈতিহাসিক জন্তু তার মাথা সমকোণে ঘোরাচ্ছে। ও ব্রায়ান এইভাবেই 'লস্ট ওয়ার্ল্ড' ও 'কিং কং' ছবির প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য সৃষ্টি করেছিলেন, কিং কং ছবিতে গোরিলা ও টেরোড্যাকটিলের লড়াই দেখিয়েছিলেন। আধ ঘন্টার এই লড়াইয়ের ছবি তুলতে ও'ব্রায়ানের দশ দিন সময় লেগেছিল। তৈরি হয়েছিল কিং কংয়ের ২৭টি মডেল এবং এক বিশালাকায় গোরিলার লোমশ হাত। নায়িকা ফে রে'কে সেই হাতের মধ্যে রেখে ক্রেন দিয়ে ওঠানো-নামানো হত।

আজকালকার স্পেশাল এফেক্ট করা হয় পুরোদস্তুর বিজ্ঞানের সাহায্যে। কুবরিকের '২০০১ : এ স্পেস ওডিসি' ছবিতে বৃহস্পতি গ্রহের চারদিকে যে মেঘের আবহমণ্ডল দেখা গিয়েছিল তা আর কিছুই নয়। ভয়েজার-এর পাঠানো কিছু ছবিকে নামার ক্রে সুপারকম্পিউটারের সাহায্য বাড়িয়ে তার ফোটোগ্রাফ তোলা হয়েছিল।

ওব্রায়ানের পর আজকের পৃথিবীতে স্পেশাল এফেক্টের জাদুকর কার্লো র‍্যামবাল্ডি। র‍্যামবাল্ডির বুদ্ধির জোরে তোলা স্পেশাল এফেক্ট দেখা গেছে 'ক্লোজ এনকাউন্টারস অব দ্য থার্ড কাইন্ড', 'ই.টি.' ও 'অ্যালিয়েন' ছবিতে।

প্রথম কল্পবিজ্ঞান কাহিনী

পৃথিবীতে প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প কোনটি ? কে লিখেছিলেন কল্পবিজ্ঞানের প্রথম গল্প ? এইচ জি ওয়েল্স, জুলে ভার্ন, নাকি এডগার অ্যালান পো ?
না, এইসব রথী-মহারথী নন, পৃথিবীতে প্রথম সার্থক সায়েন্স ফিকশন লিখেছিলেন উনিশ বছরের এক তরুণী, নাম মেরি ভলস্টনক্র্যাফট গডউইন। ইনি কবি শেলির স্ত্রী !
১৮১৭ সালের এক রাত্রে, জেনিভা শহরে বসে মেরি কলম নিয়ে বসেছিলেন। তাঁর বিষয়বস্তু ইনগলস্টাড্‌ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ বিজ্ঞানী। তার নাম ভিক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। বিজ্ঞানের সাহায্যে সে মৃত মানুষের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে চায়, কিন্তু শেষ অবধি তৈরি হল অতিমানবীয় এক দৈত্য। উপন্যাস প্রকাশিত হল ১৮১৮ সালের ১১ মার্চ। উপন্যাসের নাম 'ফ্রাঙ্কেস্টাইন অর মডার্ন প্রমিথিয়ুস'।
ফ্রাঙ্কেনস্টাইন উপন্যাস বের হওয়ার পর কেটে গেছে ১৭২ বছর, বিজ্ঞান ও শিল্প সবকিছুতে পৃথিবী এগিয়ে গেছে বহুদূর। কিন্তু বিজ্ঞানীমহলে আজ নবতম বিতর্কের বিষয় বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্ব কতটা। জিন-ক্লোনিং করে তাঁরা কি সত্যিই নতুন কোনও জীবের জন্ম দিতে পারবেন ? পারলেও, নৈতিকভাবে কি সেটা যুক্তিসঙ্গত ?
কল্পবিজ্ঞানের সাফল্য সেখানেই। আজ যা গল্প, আগামীকাল তাই জীবন্ত বিজ্ঞানের বিষয়।

'ব্রিজ অন দ্য রিভার কোয়াই' ছাড়াও সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে যায় স্টার ওয়রসের নাম। 'ডুরান্ত ডুরান্ত' ছবির প্রসঙ্গে মনে পড়ে জেন ফন্ডার কথা।
কবিতা, নাটক, উপন্যাস, সাহিত্যের এইসব সমৃদ্ধ শাখার পাশে সায়েন্স ফিকশন নিতান্ত অল্পবয়সী। শেকস্‌পিয়র যখন তাঁর অমর নাটকগুলি রচনা করছেন, সার্ভেন্তিস যখন উপন্যাস লিখছেন, তখনও পৃথিবীতে সায়েন্স ফিকশন নামে কোনও শব্দ সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু আজ আর সায়েন্স ফিকশনকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। হার্জ তথাকথিত কোনও সায়েন্স ফিকশন লেখক নন, তিনি 'টিনটিন' নামে এক মজার কমিক-চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। সুপারম্যান, ব্যাটম্যান বা হি-ম্যানের কথা ছেড়ে দিলাম, কিন্তু খোদ টিনটিনও চাঁদে ঘুরে এসেছে। ম্যানড্রেক বা ফ্ল্যাশ গর্ডন-এর ক্ষেত্রেও কমিকস এবং সায়েন্স ফিকশন একাকার হয়ে গেছে। সিনেমার পরদায় এরা বার-বার ঘুরে-ফিরে এসেছে। সুপারম্যানের ভূমিকায় ক্রিস্টোফার রিভকে আজও ভোলা যায় না, ব্যাটম্যান ও ফ্ল্যাশ গর্ডনকে নিয়েও সিনেমা তৈরি হয়েছে।

চল্লিশের দশক থেকে কল্পবিজ্ঞান-কাহিনীর অন্যতম প্রধান লেখক আর্থার সি· ক্লার্ক। মহাকাশপাড়ি তাঁর একটি প্রিয় বিষয়। কুবরিকের ২০০১: এ স্পেস ওডিসির অন্যতম লেখক ক্লার্ক ১৯৮২-তে লিখেছেন ওই কাহিনীরই পরবর্তী পর্যায়—২০১০ : ওডিসি।

আয়ান ফ্লেমিংয়ের জেমস বণ্ড কোনও কমিক-চরিত্র নয়, সে একজন সিক্রেট ডাবল এজেন্ট বা গুপ্তচর। 'মুনরেকার' উপন্যাসে এহেন জেমস বণ্ডকেও টিনটিনের মতো চাঁদে পাড়ি দিতে হয়েছিল। শুধুমাত্র বয়সে শিশু বলেই সায়েন্স ফিকশনকে আজ

আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা যাবে না, শিশুরাও তাদের নিজস্ব অধিকারে পৃথিবীতে নিজেদের জায়গা করে নেয়। নির্বাক যুগ থেকে সিনেমা বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। রুপোলি পরদায় কল্পবিজ্ঞানকে জীবন্ত করতে গেলে কী দরকার ? দুর্দান্ত 'সেট' আর অসাধারণ ক্যামেরার কাজ।
ক্যামেরার এই কারসাজি বা 'স্পেশাল এফেক্ট' ব্যাপারটা নির্বাক সিনেমার সময় থেকে চলে আসছে। জর্জ মেলিস নামে এক ফরাসি যুবক লুমিনেরদের সিনেমা দেখে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হন। মেলিস নিজে প্রোজেক্টর ও সেলুলয়েডের রিল কিনে সেই ভোজবাজির খেলা দেখাতে শুরু করেন এবং একদিন আচমকা লক্ষ করেন ক্যামেরার লেন্সটিকে জ্যাম করে দিয়ে বিভিন্ন অদ্ভুত ছবি তোলা যায়। মেলিসকে আর কে পায় ? ১৯০২ সালে তিনি 'ভয়েজ ডান্স লা লুনে'

নামে একটি সিনেমা (অবশ্যই নির্বাক) তৈরি করলেন। এক অধ্যাপক রকেটে চড়ে বসলেন, রকেটটা একটা কামান থেকে গোলার মতো ছোঁড়া হল এবং চাঁদে গিয়ে আটকে গেল। এটিই পৃথিবীর প্রথম সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম।

চাঁদের প্রতি মেলিসের এত আকর্ষণ কেন? জর্জ মেলিস দুটি বইয়ের কাছে তাঁর ঋণ-স্বীকার করেছিলেন। প্রথম বইটি বেরিয়েছিল ১৮৬৫ সালে। বইটির নাম 'ফ্রম দ্য আর্থ টু দ্য মুন', লেখকের নাম জুলে ভার্ন। দ্বিতীয় বইটি বেরিয়েছিল ১৯০১ সালে। বইয়ের নামে 'ফার্স্ট মেন অন দ্য মুন', লেখক এইচ জি ওয়েলস।

পৃথিবীর প্রথম প্রকৃত সায়েন্স ফিকশন সিনেমা তৈরি করেছিলেন ফ্রিৎজ লাং, ১৯২৭ সালে। ছবির নাম 'মেট্রোপলিস'। ছবির বিষয়বস্তু ২০০০ সালের এক আধুনিক শহর। শহরের শ্রমিকরা মাটির নীচে বাস করে, দিনের বেলায় তারা মাটির ওপরে আসে, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে।

শহরের অধিপতি হলেন জন ফ্রেডারসন। তাঁর ছেলে ফ্রেডার ও ফ্রেডারের বান্ধবী মারিয়া এই অবস্থা সহ্য করতে পারে না, তারা শ্রমিকদের বিদ্রোহ করতে উসকে দেয়। ফ্রেডারসন এক উন্মাদ বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে মারিয়াকে চুরি করে ও মারিয়ার মতো দেখতে এক রোবটকে শহরে ছেড়ে দেয়। কিন্তু ততদিনে বিদ্রোহ হাতের বাইরে চলে গেছে। ছবির শেষে মেট্রোপলিস জলে ডুবে যায়, আসল মারিয়া কয়েদখানা থেকে পালিয়ে আসে, সে ও ফ্রেডার দু'জনে মিলে শহরের শিশুদের জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে।

নির্বাক যুগেই ছবি হয়েছিল এইচ জি ওয়েলসের ফার্স্ট মেন অন দ্য মুন এবং স্টিভেনসনের 'ডঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড'। নির্বাক যুগের আর-একটি অসাধারণ ছবি তুলেছিলেন হ্যারি হয়েট, আর্থার কোনান ডয়েলের উপন্যাস অবলম্বনে এই ছবির নাম 'দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড'। প্রোফেসর চ্যালোনারের ধারণা আমাজনের অরণ্যে এক গভীর মালভূমিতে প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর, টেরোড্যাকটিল ইত্যাদি প্রাণী আজও বেঁচে

'দ্য রিটার্ন অব দ্য জেডি' ছবিতে বিখ্যাত দুই রোবট— 'সি থ্রি পিও' এবং 'আর টু-ডি টু'

স্ট্যানলি কুবরিক

স্ট্যানলি কুবরিক-এর বিখ্যাত ছবি '২০০১ : এ স্পেস ওডিসি'। আর্থার সি ক্লার্ক-এর বিখ্যাত গল্প 'সেন্টিনেল' অবলম্বনে তৈরি হয়েছে এই ছবি।

স্টিভেন স্পিলবার্গ

স্টিভেন স্পিলবার্গের ছবির বৈশিষ্ট্য জোরালো গল্প, চমক ও জাঁকজমক। তাঁর 'ই. টি' ছবিতে শিশুদের বিশেষ ভূমিকায় দেখা যায়।

আইজাক আসিমভ

আইজাক আসিমভ-এর লেখা কল্পবিজ্ঞান-কাহিনীগুলি সারা বিশ্বে সমাদৃত। বিজ্ঞানের নানা লেখার সংকলনও সম্পাদনা করেছেন।

ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো

ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো তৈরি করেছিলেন 'ফারেনহিট ৪৫১'। রে ব্র্যাডবেরির বিখ্যাত কাহিনীর চলচ্চিত্ররূপ ত্রুফোর ছবিটিও বেশ নাম করেছিল।

আছে। চ্যালোনারের এক সহকর্মী সেখানে রীতিমত রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে যান। চ্যালোনার তাঁর দলবল নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। তাঁর ধারণাই ঠিক। লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা আজও বেঁচে আছে। ডাইনোসর, প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য ইত্যাদি সৃষ্টির মাধ্যমে ছবির স্পেশাল এফেক্ট আনার দায়িত্বে ছিলেন উইলিস ও ব্রায়ান। এই ও'ব্রায়ান-ই পরে কিং কং ছবির স্পেশাল এফেক্টের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৩৫ সালে মাইকেল ব্যালকন ছবি করলেন

আলেকজান্ডার কোর্ডা-র 'থিংস টু কাম' ছবির সেটে এইচ. জি. ওয়েলস

কল্পবিজ্ঞানের গল্প যখন রুপোলি পরদার মহাকাব্য

ছবির নাম	লেখক	পরিচালক	মুক্তির সময়
দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড	আর্থার কোনান ডয়েল	হ্যারি ও. হয়েট	১৯২৫
কিং কং	এডগার ওয়ালেস	মেরিয়ান কোল্ডঅয়েল কুপার	১৯৩৩
থিংগস টু কাম	এইচ জি ওয়েলস	আলেকজান্দার কোর্ডা	১৯৩৬
টুয়েন্টি থাউজান্ড লিগস আন্ডার দ্য সি	জুলে ভার্ন	রিচার্ড ফ্লেশ্চার	১৯৫৪
জার্নি টু দ্য সেন্টার অব আর্থ	জুলে ভার্ন	হেনরি লেভিন	১৯৫৯
ফারেনহিট ৪৫১	রে ব্র্যাডবেরি	ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো	১৯৬৬
২০০১ : আ স্পেস ওডিসি	আর্থার সি ক্লার্ক	স্ট্যানলি কুবরিক	১৯৬৮
সোলারিস	স্ট্যানিস্ল লেম	আন্দ্রেই তারকোভস্কি	১৯৭৭
স্টার ওয়রস	জর্জ লুকাস	জর্জ লুকাস	১৯৭৭
ক্লোজ এনকাউন্টারস অব দ্য থার্ড কাইন্ড	স্টিভেন স্পিলবার্গ	স্পিলবার্গ	১৯৭৭
সুপারম্যান	মারিও পুজো	রিচার্ড ডোনার	১৯৭৮
অ্যালিয়েন	ড্যান ও ব্যানন	রিডলে স্কট	১৯৭৯
দ্য এম্পায়ার স্ট্রাইকস ব্যাক	জর্জ লুকাস	আরভিন কার্সনার	১৯৮০
আউটল্যান্ড	পিটার হায়ামস	পিটার হায়ামস	১৯৮১
ই. টি.	স্টিভেন স্পিলবার্গ	স্পিলবার্গ	১৯৮২
ক্রুল	স্ট্যানফোর্ড শারম্যান	পিটার ইয়েটস	১৯৮৩

'দ্য টানেল'। ম্যাকঅ্যালেন নামে এক তরুণ স্থপতি অতলান্তিক মহাসমুদ্রের নীচে আমেরিকা থেকে স্পেন অবধি একটা টানেল খুঁড়তে চায়, কীভাবে সে সফল হল এই নিয়ে ছবিটির গল্প। টানেল তখনকার দিনের এক সুপারহিট ছবি।

ব্যালকনের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেকজান্দার কোরডা এবার একটা দাবার চাল খেললেন। তিনি এইচ জি ওয়েলসের গল্প নিয়ে ওয়েলসকে দিয়েই চিত্রনাট্য লেখালেন। ছবির নাম 'থিংগস টু কাম'।

১৯৪৯ সালে জর্জ পল প্যারামাউন্ট পিকচার্সের অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। পল 'ডেস্টিনেশন মুন' নামে একটি ছবি করবেন, এতদিনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, রকেট, পরমাণু বোমা, চালকবিহীন ফাইটার প্লেন ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। পলের এই ছবিতে তাই রকেট বাস্তব রকেটের মতোই দেখতে হবে। প্যারামাউন্টের ব্যানারে পল আগে দুটি ছবি তৈরি করেছিলেন, দুটিই সুপারফ্লপ! প্যারামাউন্ট পিকচার্স আর জর্জ পলের দায়িত্ব নিতে চায় না!

'ঈগল-লায়ন' নামে এক ছোট্ট প্রযোজক কম্পানি প্রযোজনা করেছিল ডেস্টিনেশন মুন। পৃথিবীর প্রথম স্পেস-এজ সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম।

ডিজনির স্টুডিওতে কল্পবিজ্ঞান ছবির মহাকাশযানের একটি নকশা

১৯৫৪ সালে ওয়াল্ট ডিজনি প্রোডাকশন-এর ব্যানারে তৈরি হল টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগস আণ্ডার দ্য সি । পাঁচ লক্ষ ডলার ব্যয়ে তৈরি এই ছবিতে দেখানো হয়েছে সাবমেরিন, স্কুইড ও মহাসমুদ্রের অতল রহস্য । জুলে ভার্নের ক্যাপ্টেন নিমো আর জেমস ম্যাসন এখানে মিলেমিশে একাকার ।

১৯৬৬ সালে তৈরি হল এক অসাধারণ ছবি, 'ফ্যানটাস্টিক ভয়েজ' । এক বিজ্ঞানী দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন, ঠিক হল কয়েকজন মানুষকে আকারে ছোট করে, ক্যাপসুলে ভরে লোকটির শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে । শরীরের অভ্যন্তরে রোমাঞ্চকর এই ভ্রমণের নাম ফ্যানটাস্টিক ভয়েজ । ছবির প্রযোজক-কম্পানি হল টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স ।

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হল আর-এক বিখ্যাত ফিল্ম-প্রযোজক কম্পানি । তাদের নাম মেট্রো-গোল্ডউইন মেয়ার । এই কম্পানি তাদের নতুন ছবি পরিচালনার দায়িত্ব দিল স্ট্যানলি কুবরিককে । ঠিক হল, আর্থার সি ক্লার্ক-এর ছোটগল্প 'সেন্টিনেল' থেকে ছবিটি তৈরি করা হবে, ছবির চিত্রনাট্য লিখবেন কুবরিক ও আর্থার সি ক্লার্ক । ছবির নাম,' ২০০১ : আ স্পেস ওডিসি । মহাকাশযানে চড়ে বৃহস্পতি গ্রহের দিকে রওনা হয়েছে নভোচারী বাউম্যান ও

'মেরুনড' ছবির যন্ত্রঘর

'ডুরাণ্ড ডুরাণ্ড'

পুল । নভোযানের দায়িত্ব রয়েছে হ্যাল ৯০০০ নামে এক কম্পিউটারের ওপর । কম্পিউটার সবসময় বোঝাতে চায় সে 'বস', ইচ্ছাকৃতভাবে সে নভোচরদের 'লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম' কেটে দেয়, নভোযানকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয় । পল মারা যায়, বাউম্যান বৃহস্পতির বাইরে এক অনন্ত সময়-প্রবাহে পড়ে যায় ।

১৯৭৭ সালে জর্জ লুকাসের পরিচালনায় মুক্তি পেল স্টার ওয়রস । নায়ক লিউক স্কাইওয়াকার চলেছে অন্য গ্রহে বন্দিনী এক রাজকন্যাকে মুক্ত করতে । লিউকের ভূমিকায় মার্ক হ্যামিল । গ্রহ বনাম গ্রহের এই যুদ্ধে মার্ক হ্যামিলকে সাহায্য করেন হ্যারিসন ফোর্ড, আলেক গিনেস ও সি-থ্রি পি ও এবং আর টু-ডি টু নামে দুটি রোবট। শত্রু ডার্থ ভ্যাডার আসলে লিউকের বাবা । ডার্থ ভ্যাডার ও লিউকের মধ্যে লেসার-রশ্মির তরবারি নিয়ে যুদ্ধ হয় । গ্রহ-গ্রহান্তরের অদ্ভুতদর্শন সব প্রাণী যুদ্ধে লিপ্ত হয় । বস্তুত, স্টার ওয়রসের সাফল্যই এর পরবর্তী দুটি ধারাবাহিক ছবির জন্ম দিয়েছিল । 'দ্য এম্পায়ার স্ট্রাইকস ব্যাক' ও 'দ্য রিটার্ন অব দ্য জেডি' ।

১৮ লক্ষ ডলার ব্যয়ে কলম্বিয়া পিকচার্সের ব্যানারে তৈরি হল স্টিভেন স্পিলবার্গের ছবি ক্লোজ এনকাউন্টারস অব দ্য থার্ড কাইণ্ড । উড়ন্ত চাকিতে করে ভিন গ্রহের একদল জীব পৃথিবীতে আসে । রয় নিয়ারি (রিচার্ড ড্রেফুস) সেইসব উড়ন্ত চাকি দেখতে ভালবাসে, ভিনগ্রহীরা তাকে টেলিপ্যাথিতে

ভারতীয় দূরদর্শনে কল্পবিজ্ঞান

স্টার ট্রেক, সুপারম্যান বা ব্যাটম্যান এখন আর শুধুমাত্র বিদেশের দূরদর্শনে সীমাবদ্ধ নয়, ভারতের দূরদর্শনেও এসেছে কল্পবিজ্ঞান-কাহিনীর জোয়ার।

ভারতীয় দূরদর্শনে ইতিমধ্যেই দেখানো হয়েছে জাপানি সিরিয়াল 'জনি সোকো অ্যান্ড হিজ ফ্লাইং রোবট', দেখানো হয়েছে 'স্টার ট্রেক'। কিশোর জনি সোকোর হাতে একটি ঘড়ি রয়েছে, সেই ঘড়িটি আসলে এক উড়ন্ত রোবটের রিমোট কন্ট্রোল। কিশোর জনি সোকো ও তার উড়ন্ত রোবট বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর কল্যাণ করে। ভারতীয় দূরদর্শনে প্রথম স্পনসর্ড ধারাবাহিক শুরু হয় ১৯৮৪ সালে। কল্পবিজ্ঞানের গল্প প্রথম দেখানো হল 'সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস' সিরিয়ালে। পরিচালক সন্দীপ রায়, গল্পটি সত্যজিৎ রায়ের 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'। পৃথিবীর লোকে বঙ্কুবাবুকে নিতান্ত সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, কিন্তু এই বঙ্কুবাবুই অন্য গ্রহ থেকে আসা এক উড়ন্ত চাকির মুখোমুখি হন। বঙ্কুবাবুর বন্ধু অন্য গ্রহের এক মানুষ। দূরদর্শনের দ্বিতীয় সায়েন্স-ফিকশন সিরিয়াল হল 'ইন্দ্রধনুস'। এক রোবটের কাছে ছোট্ট একটি টাইম-মেশিন আছে, একদল গুন্ডা মাঝে-মাঝেই সেই টাইম-মেশিনটি চুরি করতে চায়। কিন্তু টাইম-মেশিনটি রয়েছে একদল কিশোর-কিশোরীর হাতে। সেটি নিয়ে তারা সময় থেকে সময়ান্তরে ঘুরে বেড়ায়। দূরদর্শনের তৃতীয় সায়েন্স ফিকশন সিরিয়াল 'স্পেস-সিটি সিগমা'। মহাকাশ-স্টেশন সিগমাতে থাকেন কম্যান্ডার তারা, শক্তি, কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ নভোচর এবং কয়েকটি রোবট। গ্রহান্তরের একদল হিংস্র জীব এই মহাকাশ-স্টেশনটিকে ধ্বংস করে পৃথিবীতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। গ্রহান্তরের এই জীবদের নেতৃত্ব দিচ্ছে জাহাকু। কম্যান্ডার তারা অবশ্য বুদ্ধির লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জিতে যান।

ফোটো : হীরক সেন

সন্দীপ রায় পরিচালিত 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' ছবির একটি দৃশ্য

খবর জানায়। তারা পৃথিবীর মানুষের বন্ধু। স্টার ওয়রসের মতো এখানে অহেতুক যুদ্ধ নেই। স্পিলবার্গ এই ছবির মাধ্যমে প্রথমবার জানালেন, ভিন গ্রহের জীবেরা শান্তির জন্য আগ্রহী। স্পিলবার্গের পরবর্তী ছবির ই টি আজ আর শুধু বালক এলিয়টের বন্ধু নয়, সে পৃথিবীর সব কিশোর-কিশোরীর বন্ধু।
মহাকাশ ও মানুষ নিয়ে আর-একটি অসাধারণ ছবির নাম 'অ্যালিয়েন'। অন্য গ্রহ থেকে খনিজ আকর নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসছে কয়েকজন নভশ্চর, এমন সময় কাছাকাছি এক গ্রহ থেকে বিপজ্জনক সঙ্কেত শুনতে পেয়ে তারা সেখানে যায়। সেই গ্রহে আচমকা একটি জীব কেন নামে এক নভোচারীর হেলমেটে জড়িয়ে যায়। রিপ্লে নামে আর-এক নভোচারী কেনকে নভোযানে ঢুকতে দিতে চায় না, যদি ওর হেলমেটে জড়ানো জীবটা অন্য কিছু হয়।
সায়েন্স-অফিসার অ্যাশ কেনকে ভেতরে আনে। পরের দিন খাবার টেবিলে বসে কেন আচমকা শরীরে ব্যথা অনুভব করে, একটি অন্য জীবে পরিবর্তিত হয়ে সে টানেলের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায়। একে-একে সবাই সেই অ্যালিয়েনে রূপান্তরিত হয়, থাকে শুধু রিপ্লে আর অ্যাশ। কিন্তু এইসব অন্য জীবের প্রতি অ্যাশের এত আকর্ষণ কেন? শন কোনারিকে নায়ক করে তৈরি হয়েছিল 'আউটল্যান্ড'। এখানে ছবির পটভূমিকা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বৃহস্পতির উপগ্রহ 'আইও'-কে। 'ক্রুল' ছবিতেও দেখা গেছে ভিন গ্রহের বীভৎসদর্শন জীবদের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই। আন্দ্রেই তারকোভস্কির ছবি 'সোলারিস'-এর নায়ক ক্রিস কেলভিন সোলারিস গ্রহে যাবে। সেই গ্রহের সমুদ্রও প্রবল অনুভূতিপ্রবণ, সমুদ্র থেকে মানুষের মতো জীবের সৃষ্টি হয়, এবং তারা কেলভিনের নভোযানে ঢুকে পড়ে। কল্পবিজ্ঞানের ছবি মানে শুধুমাত্র ডাইনোসর আর টেরোড্যাকটিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, স্পেস-স্যুট পরে লেসার গান নিয়ে ভিনগ্রহীদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ নয়। কল্পবিজ্ঞানের ছবি মানেই কোনও 'বিগ বাজেট এন্টারপ্রাইজ' নয়। কল্পবিজ্ঞান মানুষের আগামী দিনে নতুনভাবে বাঁচার কাহিনী।
পৃথিবীকে বদল করার স্বপ্ন দেখি, সুন্দর করার স্বপ্ন দেখি, নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখি। কখনও-কখনও সিনেমা, সায়েন্স ফিকশন, কবিতা সব কিছু মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় নতুন মহাকাব্য।

উল্লেখযোগ্য ছবি 'দিস আইল্যান্ড আর্থ'। ১৯৫৫ সালে তৈরি এই ছবিতে উড়ন্ত চাকির পর্যবেক্ষণ-কক্ষ, মেটালুনা নামের এক কাল্পনিক গ্রহের নিসর্গদৃশ্য ছিল দেখবার মতো। বিচিত্র প্রাণীদেরও দেখা গেছে এই ছবিতে।

ধারাবাহিক উপন্যাস

সোনার গণপতি হিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শুভঙ্কর বলল, "গণপতি উদ্ধার মাথায় থাকুক এখন। আগে চলো কনকদুর্গার মন্দিরে গিয়ে বিল্টুকে উদ্ধার করি। তারপর তিন্নিকে উদ্ধার করে আলেয়ার পিছনে ছুটব।"

বিস্মিত মউ বলল, "এ তুমি কী বলছ! বিল্টুদা কনকদুর্গার মন্দিরে, এ-কথা তুমি জানলে কী করে?"

"খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, না? কড়ি আমাকে যা বলেছে।"

"কী বলেছে সে?"

শুভঙ্কর এক-এক করে সব কথা খুলে বলল মউকে।

মউ বলল, "তা হলে শোনো, ভচু নামের এই দুর্বৃত্ত সোনার গণপতি নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেও সে কখনওই ও জিনিস শিকারিবাজের হাতে তুলে দেবে না।"

"এরকম পরিকল্পনা ওদের তো আগে থেকেই ছিল। তখন ওরা ছিল দু'জন, এখন একজন।"

"তা হলে আমার অনুমান ঠিক। অতএব কনকদুর্গার মন্দিরে সোনার গণপতির সামনে বিল্টুদাকে বলি দেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব

"ডুলুং নদী! ভারী চমৎকার নাম তো!"

"অনেকটা তোমার ওই তিন্নির মতো। মিষ্টি নামের যেমন

হচ্ছে না। তবে ওরা ওকে ছাড়বে না। অনেক নির্যাতন করবে। শেষ পর্যন্ত মেরেও ফেলবে। কেননা, শিকারিবাজের মুখে গরম কফি ছুঁড়ে মারার কথা শিকারিবাজ কি এত সহজে ভুলবে?"

"তা হলে আর দেরি নয়। এখনই চলো।"

মউ বলল, "যেতে তো হবেই। কিন্তু সে অনেক দূরের পথ। তার ওপর সে পথ এই রাত দুপুরে অনেক বিপদসঙ্কুল। এখন কীভাবে আমরা যাব সেইটাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়। কোনও পরিবহণই তো এখন পাব না। আমাদের যেতে হবে কোকপাড়া, চাকুলিয়া, দুটো স্টেশন পার হয়ে গিধনি। গিধনিটা অবশ্য সিংভূমে নয়, বাংলায়। গিধনি থেকে প্রায় আট-দশ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে তবেই চিলকিগড়। চিলকিগড়ের বিশাল রাজবাড়ির পাশ দিয়ে গ্রামে ঢুকে ডাইনে-বাঁয়ে বাঁক নিয়ে ঝোপঝাড় পার হয়ে বর্ষায় স্ফীত দুরন্ত ডুলুং নদী অতিক্রম করতে হবে।"

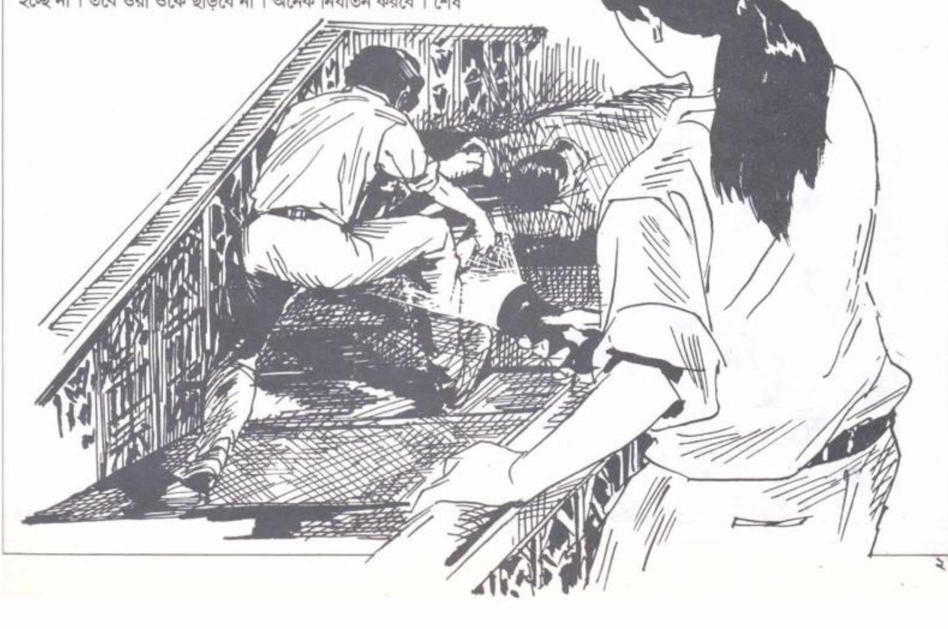

১		২		■	৩		৪	■	৫
	■		■	৬		■	৭		
৮			■	৯				■	
■	■	১০			■	■	১১		
১২			■	১৩	১৪		■	■	
	■	■	১৫			■	১৬		
১৭		১৮	■	■	১৯			■	■
	■	২০		২১		■	২২		২৩
২৪			■	২৫		■		■	
	■	২৬			■	২৭			

সংকেত : পাশাপাশি : (১) লেলিহান হয়ে দেখা দিলে ভয়ংকর হতে পারে। (৩) নবাবের মতো আচার-আচরণ। (৬) এর ডিম্ব মানেই অসার বা অলীক বস্তু। (৭) চোখে পড়ে। (৮) জাতিবিশেষ। (৯) জ্যোতিষে তিন গণের এক। (১০) কোকিল যার সখা। (১১) স্বর্গের বিপরীত। (১২) কাক। (১৩) নর্তক-নর্তকী। (১৫) গোড়ায় পা থাকলেও থাকে মাথায়। (১৬) এ-পাখি শেখালেই বুলি শেখে। (১৭) প্রতিমূর্তি। (১৯) উলটো দিকে বইছে। (২০) গ্রামে গরমের ভরসা। (২২) রামায়ণের মায়াবী রাক্ষস। (২৪) ফ্লোরিডা উপদ্বীপ ও হাইতি দ্বীপের মাঝখানে দ্বীপপুঞ্জ। (২৫) মনের বা মতের মিল হওয়া। (২৬) বাঁকা। (২৭) পরদা।

উপর-নীচ : (১) অতলস্পর্শী। (২) ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের বিশেষ নাম। (৩) বিনাশশীল। (৪) বিক্রয়। (৫) স্বতস্ফূর্ত কল্পনা বা রচনা। (৬) ঝিলম নদীর তীরে কাশ্মিরের পুরনো রাজধানী। (১২) তর্কবিতর্ক, ঝগড়াঝাটি। (১৪) শিশুরা যা বারবার দেখতে চায়। (১৬) 'ঐ — আসে।' (১৮) কোনও-কিছু উপলক্ষে বা কাউকে নিয়ে বাড়াবাড়ি আচরণ। (২১) আগুন। (২৩) এতে যতই কাটবে সুতো তত যাবে বেড়ে।

গত সংখ্যার সমাধান

তো	প	■	অ	র্গ	ল	■	ত	র	ক্ষু
শা	ড়ি	■	ন	■	শ	জা	রু	■	ধা
■	ম	চ্ছ	ব	■	ক	দু	■	ধূ	র্ত
প	রি	■	ধা	মা	র	■	শ্রী	ম	■
ন্ন	■	ম	ন	ন	■	■	ফ	ল	সা
গ	রু	ড়	■	■	মা	সু	ল	■	য়
■	চি	ক	■	প	ছ	ন্দ	■	চ	র
ধী	র	■	গু	ণ	■	র	সা	ল	■
ব	■	নী	হা	র	■	ব	■	মা	ঝি
র	গ	ড়	■	ক্ষা	ল	ন	■	ন	ল

মেয়েটি, মিষ্টি নামের তেমনই নদীটি।"

"তুমিও তো মিষ্টি।" শুভঙ্কর সস্নেহে বলল।

"ওর মতো নয়। তা যাক। সেই দুরন্ত নদী কিন্তু সব সময়ই দুরন্ত নয়। শীতকালে একবার আমরা ওখানে গিয়েছিলাম পিকনিক করতে। সে যে কী আনন্দ তা এ-জীবনে ভোলবার নয়। ছোট্ট মিষ্টি গিরিনদীটি নূপুরের ছন্দে নেচে-নেচে তির-তির করে বইছে। আমি তো থেকে-থেকে আমার স্কার্ট ভিজিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরছিলাম। অমন নদী হয় না। তা সেই নদী পার হলেই ওপারে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আর সেই জঙ্গলের মধ্যেই আছে কনকদুর্গার মন্দির। সেখানে কোনও গ্রাম নেই। তাই মানুষের বসতি নেই। সন্ধের পর নরহন্তা দস্যুদের রাজত্ব সেখানে। মন্দিরের কনকদুর্গা (সোনার) কবেই চুরি হয়ে গেছে। এখন পটের ছবিতে মায়ের পুজো হয়। অনেকটা পুরীর মন্দিরের ধরনে তৈরি এই মন্দিরটি বহু প্রাচীন। তবে এখন কয়েক বছর হল প্রাচীন মন্দিরটি ক্রমশ মাটির নীচে বসে যাওয়ায় একটি নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে। পরিবেশটা অতি সুন্দর। দু' পাশে সবুজ অরণ্যের বুক চিরে বয়ে চলা নদী, তীরে আকর্ষক প্রাকৃতিক পরিবেশে কাঁচা শালপাতায় খিচুড়ির ভোগ খেতে কী ভাল যে লাগে তা বলবার নয়। সেই নির্জন মন্দিরে ডাকাতের ভয়ে সন্ধের পর কেউ থাকে না। অতএব এই রাতদুপুরে ওখানে যাওয়া কি সোজা ব্যাপার?"

"তা হলে? তা হলে কী হবে? দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে গেলে ততক্ষণে বিল্টুর যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায়?"

"না, না। দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করব কী? যেতে আমাদের হবেই? তবে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব একটা সুগম নয়। বুদ্ধি খাটিয়ে একটা উপায় বার করে যেতে হবে।"

"তা হলে আর দেরি কেন, চলো?"

"হ্যাঁ, চলো। টর্চ আছে তোমার কাছে?"

"না। বিল্টুর টর্চটা তো ছিল। সেটা ব্যাগের মধ্যেই শ্যামলালের জিম্মায় রয়ে গেছে।"

"ঠিক আছে। তুমি পিস্তলটা সামলে রেখো। ওর পকেট হাতড়ে গোটাকতক গুলি আমি পেয়েছি। সেগুলো আমার প্যান্টের পকেটে রেখে দিয়েছি। দরকার হলে চেয়ে নিও।"

শুভঙ্কর পিস্তলটা পরীক্ষা করে বলল, "এতেও একটা লোড করা আছে।"

দাদুর ডায়েরিটা এই মুহূর্তে ওদের কাজে না লাগলেও মউ সেটাকে ওর প্যান্টের পকেটে গুঁজে রাখল। তারপর শুভঙ্কর আর ও মৃত কড়ির হাত দুটো ধরে টানতে-টানতে নিয়ে এল ঘরের বাইরে। সেখানে তখন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

শুভঙ্কর বলল, "মউ, তুমি বরং আলোটা নিয়ে এসো ঘর থেকে, আমাকে দেখাও। আমি একাই ওকে টেনে-হিঁচড়ে নামাই।"

"পারবে তো?"

"না পারবার কী আছে? কাঁধে করে চাগাতে পারব না, টেনে-হিঁচড়ে নামাতে তো পারব।"

মউ বলল, "আমাদের বোধ হয় ভুল হল। শুনেছি এই ধরনের ডেডবডি নাকি সরাতে নেই। এতে পুলিশের কাজের অসুবিধে হয়। তদন্ত ঠিকমতো করা যায় না।"

"শুনেছ ঠিকই। তবে এখন এইসব ক্ষেত্রে ওসব মানামানির কোনও ব্যাপারই নেই। এখন কত যে এইরকম হবে তার ঠিক কী? হত্যা, মৃত্যুর এই তো সবে শুরু।"

মউ আলো হাতে ধীরে-ধীরে সিঁড়ি বেয়ে এক পা এক পা করে নামতে লাগল। আর মৃত কড়ির হাত দুটো ধরে হিড়হিড় করে টানতে

লাগল শুভঙ্কর।

সিঁড়ির একটা বাঁক ঘুরেই নীচের দিকে তাকিয়ে ওরা যা দেখল তাতে শিউরে উঠল ওদের সর্বাঙ্গ।

ওরা দেখল সিঁড়ির ধাপগুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে দরজার কাছে দালানের মেঝের ওপর হাত-পা বাঁধা পুন্ডরীককাকা অসহায়ভাবে মেঝের ওপর পড়ে আছেন। তাঁর মাথার একপাশ দিয়ে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। পাশেই পড়ে আছে একটি লোহার রড।

শুভঙ্কর মউয়ের কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে তক্ষুনি বাঁধন-মুক্ত করল। পুন্ডরীককাকার চোখে-মুখে তখন দারুণ আতঙ্ক।

শুভঙ্কর বলল, "আপনার এইরকম অবস্থা কে করল?"

পুন্ডরীককাকা অতিকষ্টে বললেন, "আমি তাকে চিনি না বাবা। এমনকী, দেখিওনি।"

"সে কী!"

"তুমি চলে যাওয়ার পর ওপরের ঘরে তালা দেব বলে যেই না ভেতরে ঢুকেছি অমনি পিছন দিক থেকে মাথায় একটা আঘাত পেলাম। সে কী প্রচন্ড আঘাত! তাতেই জ্ঞান হারালাম।"

"কিন্তু লোহার রডটা ওরা পেল কোথায়?"

"এটা এখানেই দরজার পাশে রাখা ছিল। তা সে যাই হোক, সবেমাত্র জ্ঞান ফিরে পেয়েছি। কিন্তু পেলে কী হবে, নড়াচড়ার শক্তি নেই। চেঁচিয়ে কাউকে ডাকতে পারছি না। দেখছ তো আমার কী অবস্থা করেছে ওরা?"

"তা তো দেখছি। এদিকে মাথাটাও বেশ ভালরকম ফেটেছে। এই বয়সে এত জোরে মাথায় আঘাত পাওয়াটাও ঠিক নয়।"

"তোমরা দু'জনে আমাকে একটু ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে চলো। না হলে আমি কিছুতেই যেতে পারব না। আমার পা কাঁপছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। গা-টা কেমন বমি-বমি করছে।"

শুভঙ্কর বলল, "আপনার ব্যবস্থা করছি। তবে আপনার মাথার আঘাতটা যে করেছে তার লাশটা আগে বাইরে বার করি।" বলেই আবার হিড়হিড় করে টেনে নামাল লাশটাকে।

পুন্ডরীককাকা শিউরে উঠে বললেন, "এ কী! এ কার লাশ?"

"যে আপনাকে আঘাত করেছে তার। শিকারিবাজের দলের লোক। গুপ্তধনের লোভে ওপরের ঘরে ভাঙচুর করছিল, সেই সময় ওকে সাপে কামড়েছে। কেউটের ছোবল।"

"কী করে জানলে?"

"সাপটাকে আমরা চোখে দেখেছি?"

পুন্ডরীককাকার এতক্ষণে কী যেন মনে পড়তে বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও। তুমি না তখন পুলিশের গাড়িতে চলে গেলে? কিন্তু তারপরে এখানে তুমি এলে কী করে?"

"সে অনেক কথা কাকাবাবু। আমি অন্যায়ভাবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছি। ভাগ্যিস এসেছিলাম, না হলে মউ এবং আপনার কী অবস্থা যে হত তা ভগবানই জানেন। মউকে ও ঠিক এইভাবে, এর চেয়েও কঠিনভাবে বেঁধে ফেলে রেখেছিল ছাদের ওপর। ভাগ্য ভাল যে, আপনার মতো আঘাত করেনি ওকে। একে তো মোটর বাইক থেকে পড়ে গিয়ে কেটে-ছিঁড়ে একশা হয়েছে বেচারির, এর ওপর মারধর করলে মরে যেত। যাই হোক, আপনি আগে ডাক্তারখানায় গিয়ে মাথাটার ব্যবস্থা করুন। তারপর থানায় খবর দিন। আর শুনুন, আমি যে সুস্থ শরীরে এখানে ফিরে এসেছি সে-কথাটাও পুলিশকে বলবেন। আমার জন্য ওরা যেন অযথা চিন্তা না করেন। একটু পরেই মউকে নিয়ে আমি উধাও হয়ে যাব। হয়তো দু-তিন দিনের মধ্যে ফিরতে পারব না। পুলিশকে শুধু সেই কথাটাই বলবেন না।"

"এই রাতদুপুরে কোথায় যাবে তোমরা?"

"আমরা বিল্টু আর তিন্নিকে উদ্ধার করতে যাব।"

পুন্ডরীককাকা উৎসাহিত হয়ে বললেন, "বলো কী! ওদের কোনও খবর পেলে নাকি তোমরা?"

"তিন্নির খবর কিছু পাইনি। তবে বিল্টুটার খোঁজ পেয়েছি। আশা করি ওকে পেলে তিন্নিকেও পেয়ে যাব।"

পুন্ডরীককাকা হতাশ হয়ে বললেন, "আমার মেয়েটারই কোনও খোঁজ পেলে না বাবা? তা এ-কথা পুলিশকে বলতে বারণ করছ কেন?"

"বারণ করছি এই কারণে, আমরা গভীর রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি কাজ সারব। আর পুলিশকে জানিয়ে দিলে হবে কি, ওরা জিপ-টিপ নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে হাজির হবে, তারপর হাঁকডাক করে সব ভেস্তে দেবে। কেননা, ওই জঙ্গলের ধারেকাছেও গাড়ির আওয়াজ পেলে সতর্ক হয়ে যাবে ওরা।

শুভঙ্কর ও মউ আর কথা না বাড়িয়ে ভচুর ডেডবডি একেবারে ঘরের বাইরে বার করে দিল। তারপর দু'জনে দু' দিক থেকে পুন্ডরীককাকাকে ধরাধরি করে নিয়ে চলল ঘরের দিকে। এইটুকু পথ যেতেই যেন প্রাণান্ত হয়ে গেল।

পুণ্ডরীককাকার ওই অবস্থা দেখেই চিৎকার করে উঠলেন কাকিমা, "এ কী! আমার এ সর্বনাশ কে করল?"

শুভঙ্কর বলল, "কাকিমা, এখন কান্নাকাটির সময় নয়। আপনি এক্ষুনি, গ্রামের ডাক্তারবাবুকে খবর দিন।"

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

লিডিয়া অঞ্চল থেকে কেবলমাত্র গ্রিসীয়রাই নয়, পারসিকরাও পেয়েছিল তাদের প্রথম মুদ্রা। হখামনিশীয় (Achaemenid) সম্রাট প্রথম দারয়বৌশ (Darius 1) (৫২২-৪৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) লিডিয়ারাজ ক্রেসাসের অনুকরণে সোনা ও রুপার মুদ্রা প্রচলন করেন। নিজের নাম অনুযায়ী স্বর্ণমুদ্রার নাম হয়েছিল দারিক (Daric) এবং শেকেল ওজনের নাম থেকে আসে রৌপ্যমুদ্রার নাম সিগলস (Siglos)। ১২৯৭ (বা ১৩০) গ্রেনের দারিক মূল্যে ছিল ২০টি ৮৬·৪ (বা ৮৬·৪৫) গ্রেনের সিগলসের (বা ২৫টি আথেনীয় দ্রাখমার) সমান। সোনা ও রুপার মধ্যে আনুপাতিক মূল্য ছিল ১ : ১৩·৩।

হেলেনীয় সভ্যতাশ্রিত অঞ্চলে যে মুদ্রা ব্যবস্থার সৃষ্টি হল তার ফলে কিন্তু দ্রব্য অর্থের (বিশেষত শস্যের মতো যা সহজেই ভাগ করা যায় সেইরকম দ্রব্য অর্থের) ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা শেষ হল না। রৌপ্য দ্রাখ্‌মা বা ওবলের ক্রয়ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। একটি দ্রাখ্‌মা খরচ করে মূল্যবান জিনিস কেনা যেত, আবার কিছু দ্রাখ্‌মা জমাতে পারলে বেশ ধনী হওয়াও সম্ভবপর ছিল। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য বা অল্পমূল্যের পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য তামার মুদ্রার প্রচলন হল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে।

এবার আসি প্রাচীন চিনের কথায়।

প্রাচীন চিনে (যার অবস্থান ছিল বর্তমান চিনের পূর্বাংশে) দ্রব্য অর্থ হিসেবে ব্যবহার করা হত শস্য (যেমন চাল), তামার তৈজসপত্র ও দৈনিক ব্যবহার্য জিনিস (যেমন ছুরি ও কোদাল), কাপড় (বিশেষ করে রেশমি কাপড়) এবং কড়ি। এ-ব্যাপারে বোধ হয় পশু ও গহনাও কাজে লাগানো হয়েছিল। তবে এগুলির মধ্যে কড়ির প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশি। চিনা ভাষা লিখবার জন্য ছবির মতো যেসব চিহ্ন (character) ব্যবহার করার কথা জানা যায় তাদের মধ্যে একটির নাম 'পেই' (pei), যার মানে 'কড়ি'। এই শব্দটি বোঝাতে যে ছবি ব্যবহার হত, তা 'ক্রয় করা',

ছুরি-মুদ্রার ক্রমবিবর্তনের রেখাচিত্র

দেশে দেশে টাকার আবির্ভাব: চিন

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে প্রাচীন চিনের মূল ভূখণ্ডে মুদ্রার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল। এর আগের এবং পরের ইতিহাস জানিয়েছেন **ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**

কোদাল-মুদ্রার ক্রমবিবর্তনের রেখাচিত্র

'বিক্রয় করা', 'ধন' প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত চিহ্নগুলির মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, চিনে একসময় কড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল। বস্তুত সেখানে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষ ভাগ থেকেই কড়ির ব্যবহারের প্রমাণ মেলে। ঠিক কখন এই দ্রব্য অর্থ থেকে মুদ্রার উদ্ভব হয়েছিল সে-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রখ্যাত মুদ্রাতত্ত্ববিদ জি· ম্যাকডোনাল্ড মনে করতেন, সম্ভবত চৌ বা ঝৌ বংশের দ্বিতীয় নৃপতি ছেং ওয়াং-এর আমলে খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতকে এক ধরনের মুদ্রার আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু এ-কথা বোধ হয় নিশ্চয় করে বলা যায় না। খুব সম্ভবত এই বংশের রাজত্বের শেষার্ধে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে চিনে মুদ্রার প্রচলন হয়। তবে এই মুদ্রার চরিত্র পশ্চিম এশিয়া বা ইউরোপের

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে তৈরি ও মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত কোদাল বা নিড়ানি

প্রাচীনতম মুদ্রারাজি থেকে ভিন্ন। গলানো ধাতু ছাঁচে (mould) ঢেলে তৈরি ব্রোঞ্জের কড়ি, ছুরি ও কোদাল বা নিড়ানি নির্দিষ্ট ওজন ও মাপ অনুযায়ী তৈরি হতে লাগল। প্রমাণ মাপের কোদাল বা ছুরির অনুকরণে তৈরি মাত্র কয়েক ইঞ্চি মাপের ছুরি ও কোদালের ধারগুলি ছিল ভোঁতা, কারণ এগুলি তো আর কাটবার বা কোপাবার জন্য ব্যবহার করা হত না। এগুলির ওপর উৎকীর্ণ লেখগুলি থেকে বিবিধ তথ্য জানা যায়। যেমন যে শহরের টাঁকশালে তৈরি তার নাম, এগুলি যে আইনমাফিক অর্থ, তার ইঙ্গিত, ব্যক্তিগত কিছু নাম (আঞ্চলিক শাসকের, টাঁকশালের অধ্যক্ষের বা বেসরকারি কোনও মুদ্রাপ্রস্তুতকারী বা পোদ্দারের) ইত্যাদি। নির্দিষ্ট ওজনের ব্রোঞ্জের বস্তুর গায়ে উৎকীর্ণ এই ধরনের লেখ ওগুলিকে এক শ্রেণীর মুদ্রা বলে চিহ্নিত করে।

এই ধরনের মুদ্রার প্রচলনের পরে প্রমাণ মাপের আসল ছুরি বা কোদাল বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে আর ব্যবহৃত হত কি না ঠিক জানা নেই। তবে অনেক পণ্ডিত এইগুলিকে

কোনও নির্দিষ্ট মানের একক (Unit) এবং নকল ছুরি ও কোদালগুলিকে সেই মানের ভগ্নাংশের ইঙ্গিতকারী বলে অনুমান করেন। মুদ্রা হিসেবে চিহ্নিত এইসব ছুরি ও কোদালের ক্রমে-ক্রমে আকারের পরিবর্তনও ঘটেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর এক কোদালরূপী মুদ্রার চেহারা প্রায় আসল কোদালের মতোই। উপরে লেখা আছে 'গু', বোধ হয় কোনও ব্যক্তিগত নাম। অন্যদিকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে য়ুয়াং-এর টাঁকশালে তৈরি কোদালরূপী মুদ্রার সঙ্গে আসল

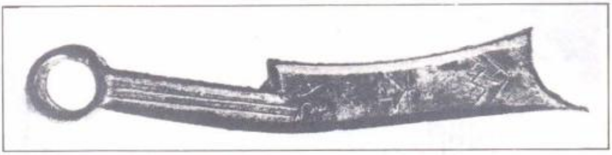

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে তৈরি ও মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত ব্রোঞ্জের ছুরি

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তৈরি ও মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত কোদাল বা নিড়ানি

কোদালের সম্পর্ক অনেক কম।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মধ্যে প্রাচীন চিনের মূল ভূখণ্ডের প্রায় সর্বত্র মুদ্রার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই শতকে গোলাকৃতি ব্রোঞ্জের মুদ্রার প্রচলন হয়। এগুলির গায়ে উৎকীর্ণ লেখ এবং মাঝখানে একটি ছিদ্র আছে। এই ধরনের ছিদ্র ব্রোঞ্জের কড়ি ও ছুরির হাতলে দেখা যায়। এগুলিকে তারে গেঁথে রাখবার সুবিধার জন্য এই ছিদ্র রাখা হত। বোধ হয় আসল কড়িকে ফুটো করে গেঁথে রাখার অভ্যাস থেকেই এই রীতির প্রচলন হয়েছিল।

পুরনো ধরনের মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করেছিলেন চিনের সম্রাট ছিন বা কিন বংশের শি-হুয়াং-তি (২২১-২১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। তাঁর আমলে আইনমাফিক মুদ্রা হল মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট গোলাকৃতি ব্রোঞ্জের খণ্ড। এর গায়ে উৎকীর্ণ লেখ-এ মূল্যের ইঙ্গিত থাকত। তাঁর 'পান-লিয়াং' বা 'অর্ধ তেল' (tael), অর্থাৎ ১২ চু বা ৭·৬৮ গ্রাম ওজনের মুদ্রার যেসব নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির ব্যাস (diameter) ২ থেকে ৩ ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় ৬ থেকে ১০ গ্রাম। ১০ গ্রামের মুদ্রাকে $1\frac{1}{2}$ পান-লিয়াং বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অবশ্য মাপ ও ওজনের কিছু তারতম্য টাকা

চিনের রাজবংশ

ঝৌ রাজবংশ	:	খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতক—খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬
কিন রাজবংশ	:	খ্রিস্টপূর্ব ২২১ — খ্রিস্টপূর্ব ২০৭
হান রাজবংশ	:	খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ — ২২০ খ্রিস্টাব্দ
সুই রাজবংশ	:	৫৮১ — ৬১৮ খ্রিস্টাব্দ
তাং রাজবংশ	:	৬১৮ — ৯০৭ খ্রিস্টাব্দ
সং রাজবংশ	:	৯৬০ — ১২৭২ খ্রিস্টাব্দ
লিয়াও রাজবংশ	:	৯১৬ — ১১২৫ খ্রিস্টাব্দ
পশ্চিমী জিয়া রাজবংশ	:	১০৩৮ — ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ
জিন রাজবংশ	:	১১১৫ — ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দ
য়ুয়াং (মোঙ্গল) রাজবংশ	:	১২৭১ — ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দ
মিং রাজবংশ	:	১৩৬৮ — ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ
কিং (মাঞ্চু) রাজবংশ	:	১৬৪৪ — ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ
প্রজাতন্ত্র	:	১৯১২ খ্রিস্টাব্দ —
গণ-প্রজাতন্ত্র	:	১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ —

লেখ উৎকীর্ণ একটি স্বর্ণপিণ্ড (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের)

তৈরির পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকার জন্য অথবা অতিরিক্ত ব্যবহারজনিত ধাতব খণ্ডের ক্ষয়ের জন্য হতে পারে।

শি-হুয়াং-তি মূল চিনের ভূখণ্ডকে রাজনৈতিকভাবে এক সাম্রাজ্যাধীন করে ওজন,মাপ, কর-ব্যবস্থা প্রভৃতির সংস্কার করলেন। তিনি এইসময় মুদ্রা-ব্যবস্থার যে সংস্কার করলেন তার ফল মোটামুটিভাবে স্থায়ী হয়েছিল। যদিও সিংহাসনের বেআইনি দখলদার ওয়াং মং প্রথম শতাব্দীর প্রথম দশকে ছুরি মুদ্রার পুনঃপ্রবর্তন করার একবার চেষ্টা করেছিলেন। (ছিয়েন হান-শু, ৯৯ খ)। চিনের প্রাচীন মুদ্রা ব্রোঞ্জের তৈরি। এই সময় স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার প্রচলনের কথা জানা নেই। এখানে বলা দরকার, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চু অঞ্চলের রাজধানী য়িং শহরে তৈরি আধ আউন্স ওজনের যে সোনার পিণ্ডের কথা জানা যায়, তাকে ঠিক টাকা বলা যায় না।

চিনে যে মুদ্রাধারার প্রচলন হল তার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া বা ইউরোপের ধারার তফাত ছিল। এইসব ভূখণ্ডের দেশগুলির প্রাচীন মুদ্রায় নকশা বা ছবি দেখা যায়। যেসব ক্ষেত্রে লেখ থাকত না, সেখানে ছবিই ইঙ্গিত করত টাকা প্রস্তুতকারীর পরিচয়। অন্যদিকে চিনের মুদ্রায় কোনও চিত্র উৎকীর্ণ হত না। উৎকীর্ণ লেখই মুদ্রা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যের নির্দেশ দিত। (ক্রমশ)

ভুল শুধরে নাও : ৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ১১) ছবির ক্যাপশন বদল হয়ে গেছে। 'গুপ্ত যুগের স্বর্ণ মুদ্রা'র জায়গায় পড়তে হবে 'মোগল যুগের স্বর্ণ মুদ্রা' এবং 'মোগল যুগের স্বর্ণ মুদ্রা'-র জায়গায় পড়তে হবে 'গুপ্ত যুগের স্বর্ণ মুদ্রা'। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

নিশুতি রাতের অ্যাডভেঞ্চার

রঞ্জন ভাদুড়ী

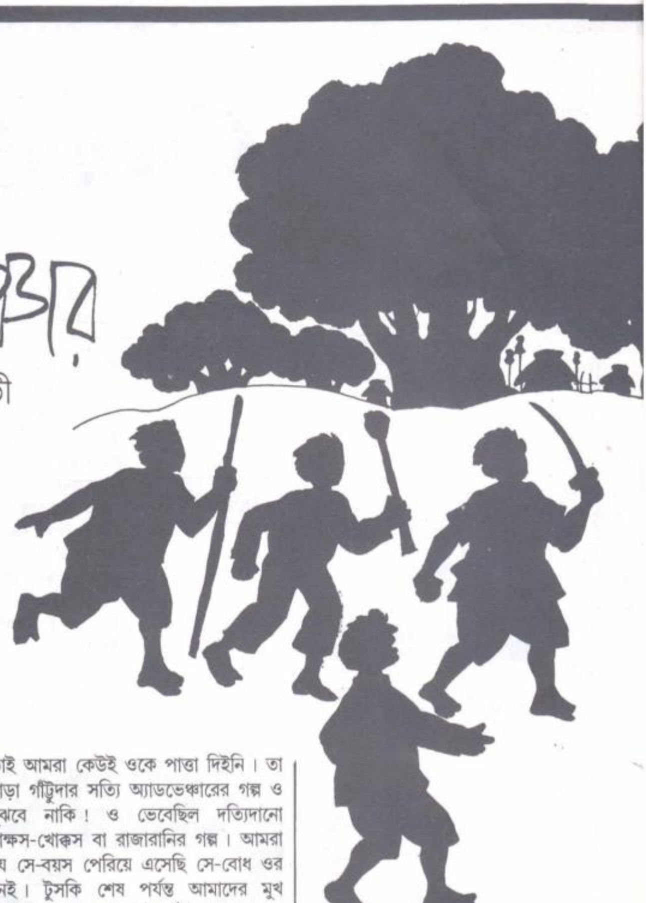

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। বোধ করি গাঁটুদা যখন ত্রিকূট পাহাড়ের উপর থেকে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে পড়িমরি ছুটছিল আর পিছনে তাড়া করেছিল একজোড়া চিতাবাঘ। মানে গাঁটুদার মুখে তার একা-একা ত্রিকূট পাহাড় অভিযানের রোমাঞ্চকর বর্ণনার ওইটুকুমাত্র শোনার পরই আমার চোখে ঘুম নেমে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত কী হল আর শোনা হয়নি। তিন-চার বছর আগে পর্যন্ত আমার বুড়ো আঙুল চোষার বদভ্যাস ছিল। ছোটকাকা বলত, জীবনভর বুড়ো আঙুল চুষেই কাটাতে হবে। কথাটা ঠিকই। নইলে গাঁটুদার অমন দম-বন্ধ-করা অভিজ্ঞতার গল্পটার আসল জায়গাটাই শুনতে পেলাম না! এক-একসময় এমন রাগ হয় না নিজের উপর!

এখন কত রাত কে জানে! হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। ভাঙলই বা কেন! অমন দারুণ গল্পের শেষটা না-শুনে ঘুমিয়েছিলাম বলেই হয়তো।

ঘরের ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখ চেয়ে আছি, কিন্তু কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। শুধু দু-তিন রকমের নাকডাক শুনতে পাচ্ছি। ওপাশের তক্তপোশে দাদু আর ছোড়দাদু শুয়ে আছেন। দুজনেরই নাক ডাকে। কিন্তু বাকি আর-একজন কে? গাঁটুদা নাকি? এত কম বয়সে কেউ নাক ডাকে? ঢাউস একখানা খাটে মোট পাঁচজন শুয়েছি। একপাশে ঠাকুমা, ঠাকুমার পাশে আমি, আমার পাশে পটকা আর মটকা, আর ওপাশে গাঁটুদা। কষ্টেসৃষ্টে আরও একজন শোয়া যায়। গল্পের গন্ধ পেয়ে টুসকিও শোবে বলে বায়না ধরেছিল। কিন্তু ওর শোয়া বড্ড খারাপ। ঘুমের মধ্যে খালি হাত-পা ছোঁড়ে। তাই আমরা কেউই ওকে পাত্তা দিইনি। তা ছাড়া গাঁটুদার সত্যি অ্যাডভেঞ্চারের গল্প ও বুঝবে নাকি! ও ভেবেছিল দত্যিদানো রাক্ষস-খোক্কস বা রাজারানির গল্প। আমরা যে সে-বয়স পেরিয়ে এসেছি সে-বোধ ওর নেই। টুসকি শেষ পর্যন্ত আমাদের মুখ ভেংচে পুবের ঘরে মা-জ্যাঠাইমাদের কাছে শুয়েছে।

পটকা আর মটকা হয়তো গল্পের শেষটা শুনেছে, তাই দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। আমার চোখে কেন যে রাজ্যের ঘুম নেমে এল গল্পের ঠিক আসল জায়গাতে এসেই! এখন গভীর রাতে বিছানায় মটকা মেরে পড়ে আছি, পটকা-মটকার সৌভাগ্যের কথা ভেবে হিংসে হচ্ছে, বাইরের তালগাছ থেকে ভেসে আসা হুতোমথুমোর ভুতুড়ে ডাক শুনছি আর ঘরের ভিতরে শুনছি নাকডাকের কোরাস। সহজে আর ঘুম আসবে বলেও মনে হচ্ছে না।

গাঁটুদা আমাদের পিসতুতো ভাই। ইয়া চওড়া বুকের ছাতি, মুগুরভাঁজা চেহারা, গায়ে দারুণ জোর, আর ভীষণ সাহসী। হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিয়ে মামাবাড়ি বেড়াতে এসেছে। রোজ রাতে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে নিজের অদ্ভুত কীর্তিকলাপের গল্প বলে, আমরা হাঁ করে শুনি। গাঁটুদার সম্বন্ধে ছোটকাকা বলে, ও যা বলে তার দু-আনা হয়তো সত্যি, বাকি চোদ্দ আনা গুলগাপ্পা। আমার অবিশ্যি তা মনে হয় না। কারণ, তিনদিন এসেছে, এর মধ্যেই গাঁটুদা নিজের সাহস আর শক্তির প্রমাণ কিছু-কিছু দিয়েছে। সরকারদের বাঘা কুকুর, যাকে দেখলে আমরা হয় গাছে চড়ে বসি, নয়তো ঘরে ঢুকে খিল দিই, সে গাঁটুদার এক দাবড়িতে কাল লেজ গুটিয়ে সেই-যে পালিয়েছে তারপর থেকে

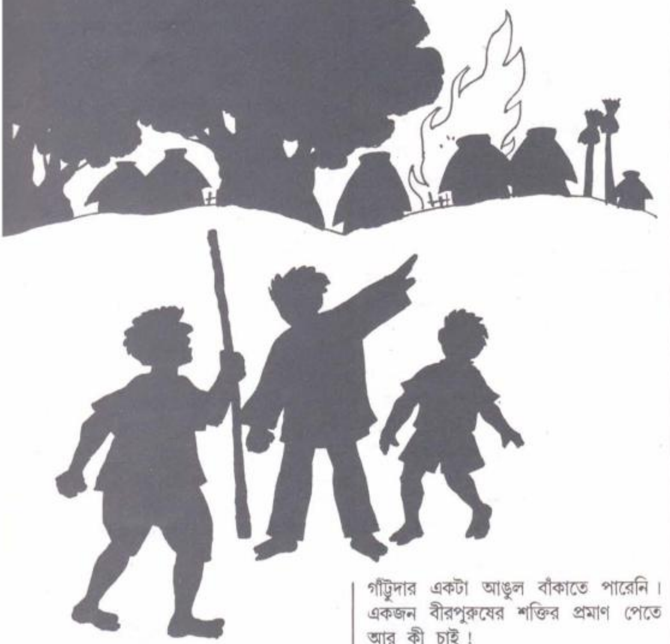

আর বাড়ির বার হচ্ছে না । পরশুদিন ঠাকুমার ঘিয়ের শিশির ঢাকার প্যাঁচ খুলতে সবাই হিমশিম খেয়ে গেল, গাঁট্টুদা চোখের নিমেষে এক মোচড়ে খুলে দিল । আজ সকালেই বাজারে দাঁড়িয়ে কথা বলতে-বলতে হঠাৎ একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে পেল্লায় বটগাছটার মাথার উপর দিয়ে এত জোর ছুঁড়ে মারল যে, সেটা আর দেখাই গেল না, যেন আকাশে মিলিয়ে গেল । উপস্থিত আমরা সবাই হাঁ হয়ে গেলাম । আমাদের দলবল সঙ্গীসাথীর মধ্যে গামুর গায়ে বেশ জোর । সবাই তাকে বলে গামা-পালোয়ান । সে হাজার টানাটানি করে গাঁট্টুদার একটা আঙুল বাঁকাতে পারেনি । একজন বীরপুরুষের শক্তির প্রমাণ পেতে আর কী চাই !

আমাদের এক বন্ধু ভোটন কাল আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'গাঁট্টুদার অমন বিচ্ছিরি নাম কে দিয়েছে রে ?' কী কথার ছিরি ! ভোটনের উপর রাগ হয়েছিল, বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম । ওর নিজের নামটা কী এমন বাহারের ! ভোটন-এর চাইতে গাঁট্টু নামটা অনেক ভাল । একটা ডানপিটে দামাল ভাব আছে । তা ছাড়া নামটার একটা ইতিহাসও আছে । ঠাকুমার মুখে শোনা । গাঁট্টুদার তখন মাস-তিনেক বয়েস । পিসি বাপের বাড়ি এসেছেন ছেলে নিয়ে । দাদু একদিন মুখের কাছে মুখ নিয়ে আদর করছিলেন । গাঁট্টুদার হয়তো খিদেয় বা পেট-কামড়ানির জন্য মেজাজটা খাট্টা ছিল তখন । দাদুর খোঁচা-খোঁচা দাড়ির খোঁচায় গাল কুটকুট করছিল এমনও হতে পারে । রেগে গিয়ে দাদুর চাঁদিতে অ্যায়সা এক গাঁট্টা মারল যে চাঁদি ফুলে একেবারে আস্ত একটা সুপুরি । গাঁট্টা খেয়ে দাদু আদর করে নাম দিয়েছিলেন গাঁট্টু । ওটাই ডাকনাম হয়ে গেছে এবং এখন ওই নামেই গাঁট্টুদার নামডাক ।

ঘুমটা আসি-আসি করেও আসছে না ছাই ! চোখের পাতা ভারী হয়ে গেছে । একবার যেন দেখলাম বাঘা-কুকুর জিব লকলকিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসছে, আর-একবার মনে হল ঝড়ে দেউড়িবাড়ির আমগাছ থেকে অনেক আম পড়েছে, কুড়িয়ে শেষ করতে পারছি না । আচমকা এইসব চোখের সামনে ভেসে-ওঠা মানেই ঘুম-আসার আগের লক্ষণ । কিন্তু হঠাৎই চটকা কেটে গেল নিশুতি রাত কাঁপিয়ে দূর থেকে ভেসে আসা একটা প্রচণ্ড কোলাহলে । এত রাতে কোথায় কিসের গোলমাল ! মনে হল পশ্চিম পাড়া থেকে আওয়াজটা আসছে । ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকল । আকাশ-ফাটানো একটা চিৎকার ভেসে এল, "পাঁচু পোদ্দারের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, তোমরা সবাই এগোও ।" গলা শুনে মনে হল মিত্তিরবাড়ির মঙ্গলকাকার । মঙ্গলকাকার গলাটা বাজখাঁই । গলার জন্য কাঁহা-কাঁহা মুলুকে থিয়েটার করতে নিয়ে যায় ।

চমকে উঠলাম—সেকী ! আমাদের গ্রামেও শেষ পর্যন্ত ডাকাত পড়ল ! পাঁচু পোদ্দার গাঁয়ের সবচেয়ে বড়লোক । তার মানে ডাকাতরা ঝোপ বুঝেই কোপ মারতে এসেছে । বারবার তিনবার একই চিৎকার শোনা গেল ! তারপর কয়েকবার দুমদুম আওয়াজ । ডাকাতরা বোধ হয় গুলি ছুঁড়ছে । পাঁচু পোদ্দারের নাতি ডাবু আমার বন্ধু । এক ক্লাসেই পড়ি আমরা । ডাকাতরা ছেলেটাকে মেরে ফেলল না তো ? ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল । ঠাকুমার মুখে রঘুডাকাতের গল্প শুনেছি, বইতেও ডাকাতের গল্প পড়েছি, কিন্তু গভীর রাতে ডাকাতের বন্দুকের আওয়াজ শুনছি, ডাকাত-পড়ার শোরগোল কানে ভেসে আসছে—এমন উত্তেজনার রাত আমার বারো বছরের জীবনে আগে আসেনি ।

ততক্ষণে ঘুমন্ত ঘরখানা জেগে উঠেছে । মায় পটকা-মটকাও । ঠাকুমা শিয়র থেকে দেশলাই বার করে হ্যারিকেন জ্বেলেছেন । । টেবিল-ঘড়িতে দেখলাম রাত দুটো বেজে কুড়ি । দাদু কাকে যেন বলে উঠলেন, "আঃ, কী করছিস ?" ছোড়দাদুর গলা পেলাম, "ও, এটা তোমার পা ? আমি অন্ধকারে বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম নিজের পা—এমন ঝিঁঝি ধরেছে—"অতি দুঃখেও হাসি পেল । ছোড়দাদু অন্ধকারে নিজের পা ভেবে দাদার পা টিপতে শুরু করেছিলেন হয়তো ।

গাঁটুদা চোখ রগড়াচ্ছে। তারপর ঘুমের ভাবটা কাটতেই খরগোশের মতো কান খাড়া করে রইল। আমি লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে গাঁটুদার চোখ দুটো শিকারি কুকুরের চোখের মতো চকচক করছে। এমন সময় আবার দুমদাম আওয়াজ।

গাঁটুদা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। দাদু বললেন, "ইস, খুব গুলি ছুঁড়ছে দেখছি। চেঁচানোই সার, গোলাগুলির মধ্যে কে এগোবে?"

গাঁটুদা বলল, "গুলি না ছাই। পেটো ফাটাচ্ছে—একটু বড় সাইজের। বন্দুকের কখনও অমন ভসকা আওয়াজ হয়? কিছুই জানো না দেখছি!" বলেই হ্যারিকেনটা ছোঁ মেরে নিয়ে খাটের তলা থেকে নিজের সুটকেসটা বার করে খুলে কী-সব বার করল। যা-ই বার করুক, তার মধ্যে রিভলভার নিশ্চয়ই আছে। আমি জানি, গাঁটুদা রিভলভার এনেছে। আগে ক'বার সুটকেস খোলার সময় আমরা আশপাশে ঘুরঘুর করেছি—যদি দেখা যায়, যদি গাঁটুদা ভালবেসে দেখায়! কিন্তু ও বড় শক্ত ঠাঁই!

প্যান্টের দু' পকেটে ঝাঁ করে কী-সব পুরে স্যান্ডো গেঞ্জি গায়েই গাঁটুদা বেরিয়ে পড়ল। পিছে-পিছে আমরাও। সবাই উঠোনে জড়ো হলাম। আর-আর ঘর থেকে বাড়ির আর প্রায় সবাই বেরিয়ে পড়েছে। একমাত্র টুসকিই বোধ হয় জাগেনি। ওর যা কুম্ভকর্ণের ঘুম। এক-একদিন সকালে কাকিমা ওকে খাটের তলায় দেখতে পান। তার মানে পড়ে গিয়েও ঘুম ভাঙে না।

পাড়াপড়শিরা চার-পাঁচজন আমাদের উঠোনে এসে দল ভারী করেছে। আমাদের বাড়িতেই লোকজন বেশি, তাই শলা করে এগনো-পিছনো যাবে—এইসব ভেবেই এসেছে।

গাঁটুদা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বলছে, "দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ফালতু পাঁয়তারা কষে কোনও লাভ হবে? আমার সঙ্গে দুজন অন্তত চলো, তারপর দেখাচ্ছি ডাকাতকে কী করে কুপোকাত করতে হয়।"

কথাগুলো ছোটকাকাকে মানে গাঁটুদার ছোটমামাকে বলা। ছোটকাকার হাতে একখানা মান্ধাতার আমলের মরচে-ধরা ভারী তরোয়াল। কারও-কারও হাতে লাঠি শাবল কাটারি। ছোটকাকা গাঁটুদাকে বলল, "চল, তুই আমি হাবুল নিতাই আর মধু—একেবারে পঞ্চপাণ্ডব। পথে আরও লোক পেয়ে যাব।"

"আমিও যাব।" আমার মুখ থেকে কথাটা গুলতির গুলির মতো বেরিয়ে গেল। পটকা-মটকা জুলজুল চোখে আমাকে দেখছে। হয়তো ভাবছে—বলে কী! কিন্তু আমি তো আর ওদের মতো ভিতু নই! আর বয়েসেও দু' বছরের বড়।

ঠাকুমা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, "অ মিনতি, এখন তোমার ছেলে সামলাও, উনি নাকি ডাকাত ধরতে যাবেন।" মিনতি আমার মায়ের নাম। এর পর ছোটকাকাকে, "তোরা যাচ্ছিস যা, গাঁটুকে নিয়ে যাচ্ছিস কেন? পরের ছেলে, যদি ভালমন্দ একটা কিছু হয়।"

গাঁটুদা ফুঃ করে উঠল। তারপর আমার হাত ধরে সবার আগে হাঁটা দিল—প্রায় ছুট। যেতে-যেতে ঠাকুমাকে উদ্দেশ করে বলল, "বলিহারি তোমাকে দিদা, মায়ের আঁচলের তলায় বসে থাকলেই চলবে ছেলেদের।"

ছোটকাকাসমেত আরও কয়েকজন আমাদের অনুসরণ করেছে। গাঁটুদার বাঁ হাত থেকে ধূমকেতুর লেজের মতো একটা আলো ঠিকরে পড়ল রাস্তায়। অথচ হাতে কিছু দেখা যাচ্ছে না। না, আছে। একটা বেঁটেখাটো কলম মনে হচ্ছে। কলম থেকে আলো! অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ওটা কী গো গাঁটুদা?"

"পেনসিল টর্চ।" সংক্ষিপ্ত উত্তর। বুঝলাম, বেদরকারি কথা গাঁটুদা বলবে না এখন।

আমি নতুন-নতুন শব্দ বা নাম শিখলেই যখন-তখন যেখানে-সেখানে লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। এর জন্য জব্দও হয়েছি অনেকবার, তবু অভ্যেস যায়নি। আলটপকা বলে ফেললাম, "পেনসিলভ্যানিয়ায় তৈরি বুঝি?" শুনে ছোটকাকার কী হাসি! গাঁটুদা কিন্তু গম্ভীর, রামগঙ্গা কিছুই বলল না। তার মানে গভীরভাবে কিছু ভাবছে।

সাবধানে যেতে হচ্ছে। পথে কোথাও-কোথাও কাদা। সন্ধেবেলা একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ এখনও গোমড়ামুখো হয়ে আছে, যে-কোনও সময়ে ভ্যাঁ করতে পারে। আশপাশের খানাডোবা থেকে নানা সুরের ব্যাঙের ডাক শোনা

যাচ্ছে। ঝোপেঝাড়ে জোনাকির জ্বলা-নেবা, প্যাঁচা-বাদুড়ের পাখার ঝটপটানি, বাঁশপাতার সরসর শব্দ। আমরা সরকারবাড়ির উঠোনে এসে পড়লাম। সেখানেও জটলা। ওদের বাঘা বীরবিক্রমে ঘেউ-ঘেউ করে চলেছে—যেন ডাকাতদের নাগালে পেলে ছিঁড়ে ফেলবে। আমাদের দেখে থেমে গেল। তারপর লেজ গুটিয়ে সিধে অন্দরমহলে। ওঃ হো, গাঁটুদাকে দেখতে পেয়েছে যে! তাই এই পিট্টান।

সরকারবাড়ির জগুদা আমাদের সঙ্গে চলল। জগুদার সঙ্গে গাঁটুদার এই দু'দিনে বেশ ভাব হয়ে গেছে। পিছন থেকে আবার বাঘার চিৎকার শোনা যাচ্ছে। জগুদা গাঁটুদাকে বলল, "তুই আছিস বলে আমার সঙ্গে এল না।"

আবার সেই দুমদুম শব্দ। এবার যেন শব্দটা দক্ষিণ দিকে সরে যাচ্ছে, তার মানে ডাকাতরা কাজ হাসিল করে ভাগলবা হচ্ছে। পাঁচু পোদ্দারের বাড়ির দিকে আকাশে লাল আগুনের হলকা উঠছে। সঙ্গে গলগল ধোঁয়া। গাঁটুদা দাঁতে দাঁত চেপে বলে, "ইস, ব্যাটারা ওদের বাড়িতে আগুনও লাগিয়ে দিয়েছে।"

ছোটকাকা বলে, "তা হয়তো নয়, ওদের পাড়াপড়শিদের কেউ খড়ের গাদায় আগুনও লাগাতে পারে। ঘুমচোখে চিৎকার শুনে সবসময় তো ঠাওর করা যায় না কোথায়

ডাকাত পড়েছে, তাই সঠিক নিশানা জানানোর জন্য গাঁ-গেরামে খড়ের গাদায় আগুন দেওয়া হয়, যাতে আগুনের হলকা দেখে লোকে বুঝতে পারে কোথায় ডাকাত পড়েছে।...কিন্তু ডাকাতরা বোমা ফাটাতে-ফাটাতে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যাচ্ছে যে! আর বোধ হয় ধরা গেল না।"

গাঁটুদা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, "ওদিকের লোকগুলো ভেরেণ্ডা ভাজছে নাকি? তোমাদের গ্রামটা অদ্ভুত, পাঁয়তারা কষতেই সময় কেটে যায় সবার, কাজের বেলা ঢু-ঢু।"

ছোটকাকা গাঁটুদার গালমন্দ চুপচাপ হজম করে যায়। জগুদা বলে, "দক্ষিণে পালাচ্ছে। তার মানে নদীপথে নৌকোয় করে।"

"তাড়াতাড়ি চলো তবে সেদিকে—আমি যে ছাই পথঘাট ভাল চিনি না, তায় আবার রাত্তির, নইলে দেখিয়ে দিতাম ডাকাত ধরতে গেলে কীভাবে ছুটতে হয়।"

কাজ হয় গাঁটুদার তিরস্কারে। এবার জগুদা আর ছোটকাকা আগে-আগে হনহনিয়ে হাঁটে। সবার পায়েই গতি বাড়ে। মেঘের ফাঁকে আকাশে একফালি আবছা চাঁদ দেখা দিয়েছে। দেখতে দেখতে আমরা পোস্টাপিস পেরিয়ে বাঁয়ে মোড় নিই। সামনে স্কুলবাড়ি, তার পরেই হাটবাজার—একেবারে নদীর ধারেই। দত্তদের নারকেল-সুপুরির বাগান পেরিয়ে পথ এখন একটু খোলামেলা। তাই আবছা হলেও সব-কিছু ঠাহর হচ্ছে। বাজারের বট-পাকুড় গাছ দুটো বিশাল দুই ঝাঁকড়াচুলো দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

'স্-স্—' জগুদা ঠোঁটে আঙুল তুলে থমকে দাঁড়ায়। মধুকাকার হাতের মিটমিটে হ্যারিকেনটা ঝট করে টেনে নিয়ে চাবি ঘুরিয়ে নিবিয়ে দেয়। একটু সময়ের জন্য আমরা সবাই স্ট্যাচু। জগুদা ফিসফিসিয়ে বলে, "লক্ষ করেছ তোমরা, স্কুলবাড়ির একটা ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক আলো দেখা গেল!" গাঁটুদা বলল সেও একটা চিকড়িমিকড়ি আলো দেখেছে দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে।

ছোটকাকা বলে, "কিন্তু স্কুলে তো রাত্তিরে কেউ থাকে না! আর এত রাতে কারও আসারও কথা নয়। কাজেই তোরা যদি আলো দেখতে পাস তো খুবই রহস্যজনক ব্যাপার। আমি অবিশ্যি কিছু দেখিনি, হয়তো মিস করে গেছি।"

"আমিও দেখেছি—আলোটা জ্বলেই নিবে গেল।" আলো-দেখনদারদের দলে ভিড়ে গেলাম আমি। আসলে আমি আলো-ফালো কিছুই দেখিনি, কিন্তু গাঁটুদা-জগুদার মন রাখতে হবে তো! হলে ওরাই আজ রাতের হিরো হবে।

পাশের পাটখেত থেকে একটা শেয়াল বেরিয়ে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়াল, তারপর দে-ছুট। এবার আমি সত্যি-সত্যি আলো জ্বলতে দেখলাম স্কুলবাড়ির পশ্চিম দিকের ঘরে। জ্বলেই নিবে গেল। আমি উত্তেজনাবশে একটু জোরেই বলে ফেললাম, "ওই যে আবার।"

গাঁটুদা আমার মুখে হাতচাপা দিল। হিসহিস করে বলল, "আরে বোকচন্দর, আস্তে—"

ছোটকাকাও চাপা গলায় বকুনি লাগাল, "জোরে কথা বলে-বলে অভ্যেস হয়ে গেছে! ওকে এনেই ভুল করেছিস গাঁটু!"

আমি চুপ মেরে গেলাম। না বাবা, আর কথা-টথা বলব না। শেষকালে আমার জন্য যদি এদের প্ল্যান ভেস্তে যায় তবে আফসোসের সীমা থাকবে না।

গাঁটুদা ছোটকাকাকে বলল, "ছোটমামা, তোমরা সবাই এখানে দাঁড়াও। টর্চের আলো দেখলে সবাই ওখানে যাবে। আমি আর জগু দেখে আসি ব্যাপারটা কী! কী বলিস জগু?" প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কী যেন দেখে নিল। নির্ঘাত রিভলভার।

জগুদা বলল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি চল।"

"আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নাও, আমি ভয় পাব না, আর কথাও বলব না।" আমি কাকুতিমিনতি করলাম।

গাঁটুদা ফিক করে হেসে বলল, "পা চালিয়ে আমাদের ফলো কর তবে। এটা হাতে রাখ, দরকার মতো জ্বালবি—যেন বলতে না হয়।" পেনসিল-টর্চটা আমার হাতে দিল।

স্কুলবাড়ির যে-ঘরখানায় দু-দুবার আলো জ্বলেছিল আমরা তিনজনে তার দরজায় দমকা হাওয়ার মতো আছড়ে পড়লাম। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কেউ তালা ভেঙে ঢুকেছে। নির্ঘাত ডাকাতদের লোক এখানে অপেক্ষা করছে। গাঁটুদা দরজায় তিনটে টোকা মারল। ভিতর থেকে সাড়া এল, "কে, সর্দার?"

জগুদা মোটাগলায় শুধু বলল, "হুঁ!" তারপর আমাকে আড়াল করে দু'জনে বাঘের মতো ওত পেতে থাকল।

দরজা খুলে গেল। যে খুলল সে কিছু বোঝার আগেই গাঁটুদার এক বিরাশি সিক্কার ঘুসি পড়ল তার চোয়ালে এবং প্রায় একই সঙ্গে পেটে পড়ল লাথি। লোকটা আঁক করে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। আমি ঠিক সময়ে

টর্চটা জ্বেলেছি—জ্বেলেই রেখেছি। বেঞ্চিতে আর-একটা লোক বসে ছিল। হতভম্ব ভাব কাটিয়ে সে কোমর থেকে একটা লকলকে ধারালো ছোরা বার করে বাগিয়ে ধরে উঠে দাঁড়াল। দুটো লোকই তাগড়া জোয়ান। প্রথম লোকটাও লাথি-ঘুসি হজম করে উঠে বসেছে। গাঁটুদা বাঘের মতো তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর তার হাত দু'খানা জুজুৎসুর এমন এক প্যাঁচে মুচড়ে ধরল যে, সে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। গাঁটুদা ধমক লাগাল, "চুপ, টুঁ-শব্দটি করলে হাত দুটো ভেঙে দেব।" দ্বিতীয় লোকটা ছোরা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবারে জগুদার খেল। সে খালি হাতেই এসেছে, কিন্তু দেখা গেল পকেট তার খালি নয়। সে তার প্যান্টের পকেট থেকে বার করল প্রায় ক্রিকেট-বল সাইজের একটা লোহার বল। সেটা ছুঁড়ে মারল দ্বিতীয় লোকটার ছোরা-উঁচনো হাত টিপ করে।

জগুদা এ-তল্লাটের ডাকসাইটে বোলার। তার বলে প্রায়ই মিডল স্টাম্প উপড়ে যায়। লোহার বলটা লোকটার কবজিতে এমন আঘাত হানল যে, তার হাতের ছোরাটা ছিটকে পড়ল সাত-আট হাত দূরে। লোকটা যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে হাত ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে সেদিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু বেঞ্চির পায়ায় হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল, আর জগুদা বিদ্যুৎ বেগে ঘরে ঢুকে তার পিঠে ঘোড়ায় চড়ার মতো চেপে বসল উবু হয়ে। লোকটার দুটো হাতই জগুদার বজ্রমুঠিতে চেপে ধরা। লোকটা পায়ের সাঁড়াশি দিয়ে জগুদার গলা পাকড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, কারণ উবু হয়ে বসা জগুদার মাথা লোকটার মাথার সঙ্গে লেপটে আছে। এক মিনিটে ডাকাতদের দুই শাগরেদই কুপোকাত। কিন্তু এরা এখানে তালা ভেঙে ঢুকে কী করছিল? ঘরে পোড়া বিড়ির গন্ধ। বাছাধনরা মৌজ করে বিড়ি যাচ্ছিল হয়তো। ওদের দেশলাই জ্বালার আগুনই আমরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম। গাঁটুদা আমাকে বলল, "লালটু, আমার বাঁ পকেটে নাইলনের দড়ি আছে, বার করে এ-ব্যাটার হাত দুটো আচ্ছা কষে পিছমোড়া করে বাঁধ তো। পারবি তো?" আমি গাঁটুদার এই হুকুমে বর্তে গেলাম। ডাকাত-ধরার কাজে আমারও তা হলে একটা বড় ভূমিকা থাকতে চলেছে! আমি জ্বলন্ত টর্চটা মুখে ধরে গাঁটুদার হুকুম তামিল করলাম। আর মাথাটা কেমন খুলে গেল। দ্বিতীয় লোকটার হাত থেকে ছিটকে-পড়া ছোরাটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে এনে অবশিষ্ট দড়িটা কেটে ফেললাম। সেটা নিয়ে জগুদাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলাম। জগুদা বলল, "শাবাশ লালটু, আগে এটার পা দুটো কষে বাঁধ।" তাই করলাম। লোকটা অবিশ্যি খুব পা ছুঁড়ছিল। বাঁধাছাঁদা হয়ে যেতেই হইহই করে ছোটকাকারা এসে পড়ল। বন্দী লোক দুটোর একজন গাঁটুদাকে বলল, "আমাদের ছেড়ে দ্যান দাদাবাবু, আমরা ডাকাতদের কেউ নই, নেতান্তই মাঝিমাল্লা।"

গাঁটুদা ধমক দিল, "চোপ, মাঝিমাল্লা তো ছোরাছুরি নিয়ে এখানে কী করছিলে? নৌকো বাইছিলে?"

আমি ও জগুদা হেসে ফেললাম। ছোটকাকারা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। আরও দুটো টর্চের আলো পড়েছে ঘরে। জগুদা চোখ টিপে বলল, "এ-দুটোকে ঘরে আটকে চলো সবাই পাঁচু পোদ্দারের বাড়ির দিকে।"

"তাই চল, পথেই ডাকাতদের অভ্যর্থনা জানাব আমরা।" তরোয়াল বাগিয়ে ছোটকাকা বলল। তারপর দরজায় শিকল তুলে জগুদার ইঙ্গিতে আমরা দৌড়ে নদীর ঘাটে গেলাম। একটা গাছের সঙ্গে একখানা ছিপনৌকো বাঁধা। বর্ষাশেষের ভরা নদী। মরা চাঁদের আলোয় স্রোত চিকচিক করছে। জগুদা দড়ি খুলে হেঁইয়ো ঠেলা মেরে নৌকোটা ভাসিয়ে দিল। তিন-চার মিনিটের বুক-দুরদুর অপেক্ষা। কয়েকটা মশালের আলো এগিয়ে আসছে। বুঝলাম, জগুদা ও-কথা বলে লোক দুটোকে বিভ্রান্ত করে ডাকাতদের বোকা বানিয়েছে।

স্রোতের টানে নৌকো অনেক দূর ভেসে গেছে। ডাকাতরা সেটা দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গেল। তারপর একটা ঝোপের আড়ালে আমাদের দেখতে পেয়ে রে-রে করে তেড়ে এল। সেই লোক দুটোকে নিয়ে ওরা মোট সাতজন। কারও হাতে বল্লম, কারও হাতে ছোরা। দুজন আমাদের দিকে মশাল ছুঁড়ে মারল। একটা মশাল আমার কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল। গাঁটুদা মাথা হেলিয়ে আর-একটাকে ব্যর্থ করল। আমাদের লোকজন তুলে নিল জ্বলন্ত মশাল দুটো। এই সময় এক ষণ্ডামার্কা ডাকাত, ওই হয়তো সর্দার, একটা বোমা ছুঁড়ে মারল আমাদের দিকে। একটা গাছের গুঁড়ি লক্ষ করে। বিকট শব্দে বোমাটা ফাটল, চার দিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। দু-চারটে টুকরোও লাগল আমাদের কারও-কারও গায়ে। আর তক্ষুনি আগুনের ঝলক দিয়ে গাঁটুদার রিভলভার গর্জে উঠল। ডাকাতরা থমকে দাঁড়াল। দু'জন দৌড়ে গিয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিল। মনে হল সেই মাঝিমাল্লা দু'জন। গাঁটুদা পাথুরে গলায় হুকুম দিল, "যার-যার হাতের অস্ত্র ফেলে দাও। এখনও পাঁচটা গুলি আছে, এবার আর শূন্যে ছুঁড়ব না, পাঁচজনেরই মাথার খুলি ফুটো করে দেব।"

পরদিন সন্ধেয় পাঁচু পোদ্দারের বাড়িতে আমাদের ডাকাত-ধরা দলের সংবর্ধনা। লুটের সব জিনিসই উদ্ধার করা গেছে। দামি গয়নার বাক্স, নগদ পাঁচ হাজার টাকা আর প্রায় আধ কিলো সোনার রাধাগোবিন্দ মূর্তি। ডাকাতদের সেই স্কুলঘরে আটকে রাখা হয়েছিল বাকি রাতটুকু। সকালে পুলিশ এসে তাদের হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে গেছে। খাবার টেবিলে আমি ফিসফিস করে গাঁটুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ডাকাতরা আত্মসমর্পণ না করলে তুমি সত্যিই গুলি করে ওদের খুলি ফুটো করে দিতে?"

গাঁটুদা হেসে বলল, "দূর পাগলা, ওটা তো টয় রিভলভার, তবে বিলিতি জিনিস, আওয়াজ সত্যি রিভলভারের মতোই।"

ছবি : দেবাশিস দেব

(এর'পরে আগামী সংখ্যায়)

কল্পবিজ্ঞানের গল্প

রোবি

আইজাক আসিমভ

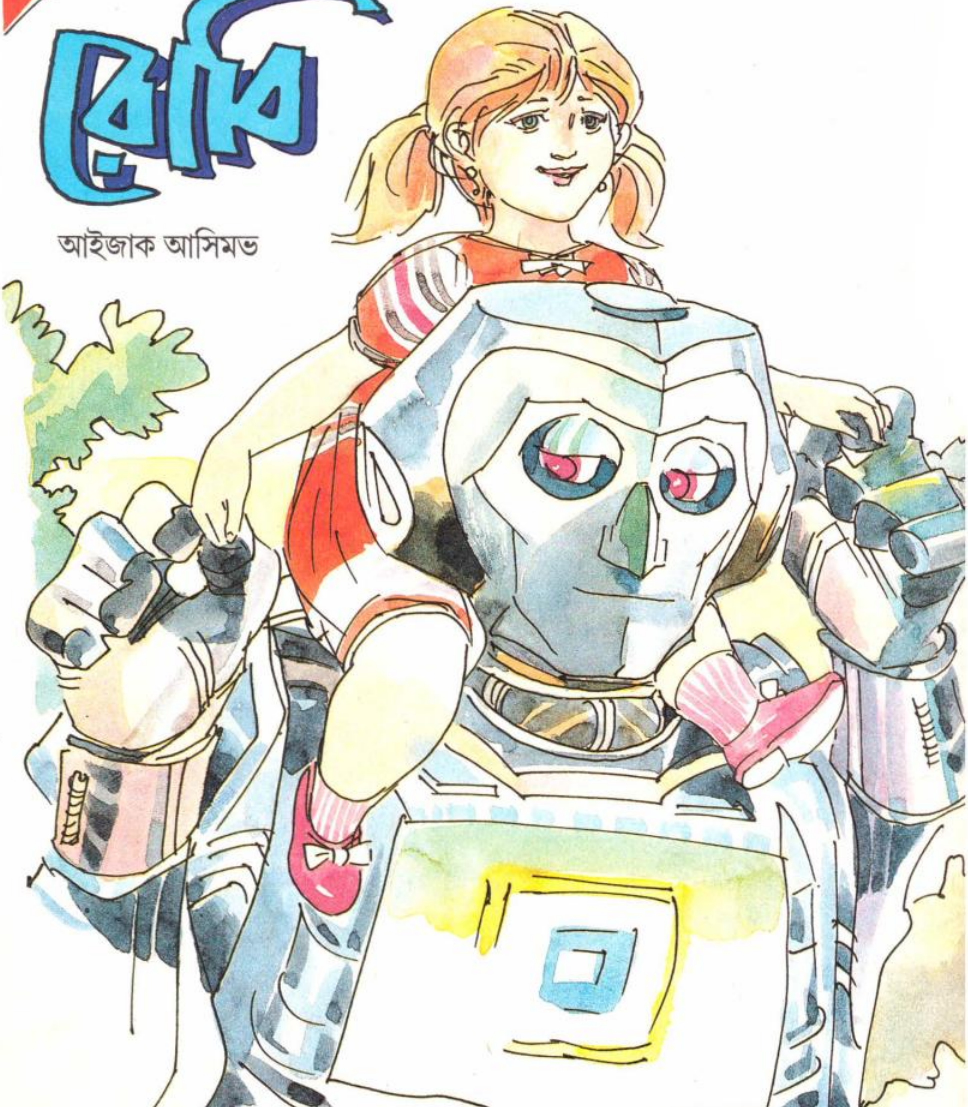

আট বছরের মেয়ে গ্লোরিয়া। একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে ছোট দুটি হাত দিয়ে দু'চোখ চেপে ধরে সে গুনে চলেছিল···আটানব্বই···নিরানব্বই···একশো। একশো গোনা শেষ হতেই সে চোখ থেকে হাত নামিয়ে নিল। রোদ্দুরের জন্য নাক কুঁচকে, চোখ পিট পিট করে তাকাল। একটু ধাতস্থ হতেই চারদিকে ভাল করে নজর করল। তারপর সতর্কভাবে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ডান দিকটা লক্ষ করল। জায়গাটা একটু অন্ধকার মতন। তাই ভাল করে দেখবার জন্য সেদিকে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল। সামনে ঝোপঝাড়। থেঁতলানো বাঁ পায়ে মাড়ানো কোনও ঝোপ খুঁজে পাওয়ার আশায় সে বকের মতো ঘাড়টা লম্বা করল। না! কোনও চিহ্ন নেই। মনে মনে গজরাল গ্লোরিয়া, 'ও নিশ্চয় বাড়ির ভেতর ঢুকে গেছে! হাজারবার ওকে বারণ করেছি—এমন করলে কিন্তু ভাল হবে না। তা কে কার কথা শুনছে?' রাগে গ্লোরিয়া ছোট্ট ঠোঁট টিপে ধরল। কপালে ভাঁজ দেখা দিল। সামনের দোতলা বাড়িটা লক্ষ করে সে ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

কিন্তু পেছনে একটা খসখসানি শব্দ। ধাতব পায়ের থপ-থপ আওয়াজ। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল গ্লোরিয়া। দেখতে পেল, তার খেলার সঙ্গী লুকনোর জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে 'বুড়ি' ছোঁওয়ার জন্য জোর কদমে ছোটা শুরু করেছে।

হতাশ হয়ে তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠল গ্লোরিয়া, "রোবি, দাঁড়াও বলছি। জোচ্চুরি কোরো না। তুমি কথা দিয়েছিলে যে, তোমাকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত তুমি দৌড়নো শুরু করবে না।" রোবির বিশাল পায়ের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে গ্লোরিয়া যেন খেপে উঠল।

বুড়ির দশ গজের মধ্যে পৌঁছে রোবির গতি আশ্চর্যভাবে কমে গিয়ে শামুকের গতি হয়ে উঠল। সেই সুযোগে গ্লোরিয়া মরিয়া হয়ে ছুটে রোবিকে ছাড়িয়ে গিয়ে বুড়ি ছুঁয়ে ফেলল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রোবিকে নিষ্ঠুরের মতো দুয়ো দেওয়া শুরু করল, "রোবি হেরো! ছুটতে পারে না। আমি তোমাকে বলে বলে হারিয়ে দিতে পারি।" রোবি যে ইচ্ছে করেই হেরে গেল, একথা তার মনেও এল না।

রোবিও কোনও উত্তর দিল না তার কথায়।

তখন দুয়ো দেওয়া থামিয়ে গ্লোরিয়া বলল, "এবার আমার পালা। ভাল করে চোখ বুজবে। চুরি করে একদম দেখবে না। তা হলে কিন্তু ভাল হবে না, বলে দিচ্ছি।" গ্লোরিয়া রোবিকে সাবধান করে দিল।

রোবির দুটো চোখের ওপর দুটো ধাতব পরদা নেমে এল। সময় বয়ে চলল টিকটিক করে। ঠিক একশো সেকেণ্ড পার হতেই রোবির চোখের ওপরের পরদা দুটো সরে গেল। রোবি চারদিকে তাকাল। কিছুদূরে একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে গ্লোরিয়ার ফ্রকের একটা অংশ দেখা যেতে রোবি সে-দিকে এগিয়ে গেল। তারপর গ্লোরিয়াকে যখন পুরোপুরি দেখা গেল রোবি তার একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

গ্লোরিয়া চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করল, "তুমি চুরি করে দেখেছ! ঠিক আছে, আমি আর তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলব না। আমি হাঁপিয়ে গেছি। এখন আমায় কাঁধে চড়িয়ে বাড়ি নিয়ে চলো।"

মিথ্যে অপবাদ শুনে রোবির মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে মাটির ওপর বসে পড়ে ঘাড় নাড়াল, অর্থাৎ, না।

গ্লোরিয়া এবার সুর নরম করে বলল, "রাগ কোরো না, রোবি। ওসব আমি এমনই বলেছি। নাও, আমায় কাঁধে নাও।"

রোবি বড় কঠিন জিনিস। তাকে ভোলানো এত সহজ নয়। সে আকাশের দিকে মুখ করে আরও জোরে জোরে ঘাড় নাড়তে থাকল।

অগত্যা গ্লোরিয়া রোবির মান ভাঙাবার

জন্য তার গলা জড়িয়ে ধরে সাধতে থাকল, "লক্ষ্মীটি, আমায় কাঁধে নাও। আমি হাঁপিয়ে গেছি। আর হাঁটতে পারছি না।" অনুনয় বিনয়েও কোনও কাজ হল না দেখে গ্লোরিয়া রোবিকে শাসাল, "বেশ, ঠিক আছে, আমি তা হলে কাঁদছি।"

শাসানিতেও রোবি নরম হল না। সে মাথা ঝাঁকিয়েই চলল।

বাধ্য হয়ে গ্লোরিয়া রোবির গলা ছেড়ে সরে এল। এবার সে তার মোক্ষম অস্ত্রটা প্রয়োগ করল, "বেশ, আমিও তোমাকে আর কোনওদিন গল্প শোনাব না। ঠিক তো?"

গ্লোরিয়ার শেষ অস্ত্রে কিন্তু আশ্চর্য কাজ হল। কোনও কথা না বলে রোবি চুপচাপ উঠে দাঁড়িয়ে সাবধানে গ্লোরিয়াকে তার চওড়া কাঁধে বসিয়ে নিয়ে দৌড় দিল। খানিক দূর যাওয়ার পর একটা ফাঁকা জায়গা দেখে রোবি আবার সাবধানে গ্লোরিয়াকে ঘাসের ওপরে নামিয়ে দিল।

জুত করে পা ছড়িয়ে বসে গ্লোরিয়া বলল, "এবার বলো, কোন গল্পটা শুনবে?"

রোবি তার হাতের আঙুল দিয়ে বাতাসে একটা অর্ধবৃত্ত আঁকল।

প্রতিবাদ করে উঠল গ্লোরিয়া, "আবার সেই বস্তাপচা গল্পটা? আমি তো ওটা তোমায় লক্ষবার শুনিয়েছি। তার চেয়ে···।"

রোবি আবার একটা অর্ধবৃত্ত এঁকে দেখাল।

অগত্যা গ্লোরিয়া বলল, "বেশ, তবে শোনো। কোনও এক সময় এলা নামে একটি সুন্দর ছোট্ট মেয়ে ছিল। তার ছিল এক নিষ্ঠুর সৎমা আর দুই কুৎসিত সৎ বোন···।"

ধীরে ধীরে গ্লোরিয়া গল্পে ডুবে গেল। ঠিক সেই সময় কোনও এক মহিলার কর্কশ ডাক ভেসে এল, "গ্লোরিয়া! গ্লোরিয়া!"

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে মহিলাটি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

মনমরা হয়ে গ্লোরিয়া বলল, "মা ডাকছে। আমায় বাড়ি নিয়ে চলো। গল্পটা পরে বলব'খন।"

রোবি সঙ্গে সঙ্গে গ্লোরিয়াকে কাঁধে তুলে নিল। তার মনের মধ্যে কোথাও যেন একটা সাবধানবাণী লুকনো রয়েছে। সে বিশ্বাস করে—কোনও রকম ইতস্তত না করে শ্রীমতী ওয়েস্টনের কথা শোনাই মঙ্গলজনক। গ্লোরিয়ার বাবা রবিবার ছাড়া সকালের দিকে বাড়ি থাকেন না। তিনি মানুষটা খুব বুঝদার এবং নরম প্রকৃতির। কিন্তু গ্লোরিয়ার মা রোবির কাছে সব সময়ে এক অস্বস্তির কারণ। সে বোঝে যে শ্রীমতি ওয়েস্টনের

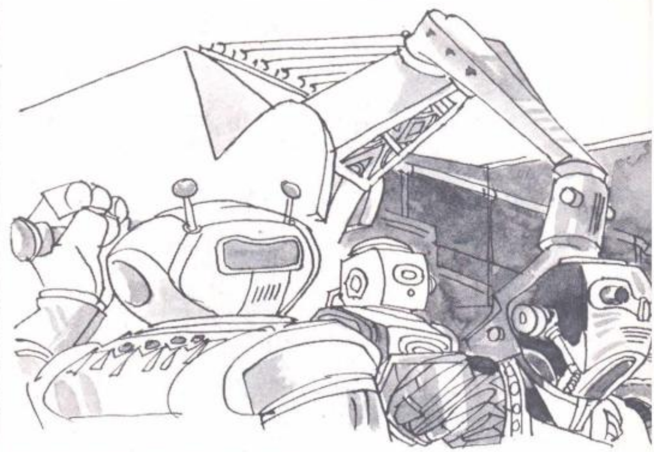

কাছ থেকে যতই সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

ওদের দেখতে পাওয়া মাত্র ঝাঁঝিয়ে উঠলেন শ্রীমতি ওয়েস্টন, "কখন থেকে চেঁচিয়ে মরছি! কোথায় ছিলি এতক্ষণ?"

"আমি তো রোবির সঙ্গে ছিলাম। ওকে সিনডারেলার গল্প বলছিলাম। বুঝতেই পারিনি যে দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।"

"তুমি না হয় বুঝতে পারোনি। কিন্তু রোবি কী করছিল? সেও কি ভুলে গিয়েছিল?" কথাটা বলার পরই যেন তিনি রোবির উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হলেন। চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিক আছে। রোবি, তুমি এখন যেতে পারো। তোমাকে গ্লোরিয়ার এখন কোনও দরকার হবে না।" এর পর তিনি আরও নিষ্ঠুরের মতো বললেন, "আর হ্যাঁ, আমি না-ডাকা পর্যন্ত তুমি এদিককার ছায়া মাড়াবে না।"

রোবি চলে যেতে চাইলেও সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারল না। গ্লোরিয়া তার হয়ে ওকালতি শুরু করেছে, "ও থাকুক না, মা। সিনডারেলার গল্পটা বলা এখনও শেষ হয়নি। আমি ওকে গল্পটা বলব বলে কথা দিয়েছি। শেষটুকু এখনও বাকি।"

"গ্লোরিয়া!" কটমট করে শ্রীমতী ওয়েস্টন গ্লোরিয়ার দিকে তাকালেন।

"সত্যি বলছি, মা। ও এমন লক্ষ্মী হয়ে থাকবে যে, তুমি বুঝতেই পারবে না ও এখানে আছে। কোণের ওই চেয়ারটায় ও বসে থাক। একটা কথাও বলবে না ও। তাই না রোবি?" সমর্থনের আশায় গ্লোরিয়া রোবির দিকে তাকাল।

"গ্লোরিয়া, তুমি যদি এসব আবদার বন্ধ না করো তা হলে এক সপ্তাহ রোবিকে দেখতে পাবে না তুমি।"

মুখ নীচু করে নিল গ্লোরিয়া, "ঠিক আছে, কিন্তু মা, ও যে সিনডারেলার গল্পটা ভীষণ ভালবাসে! আমার বলা শেষ হয়নি। গল্পটা ওর খুবই প্রিয়।"

শেষ পর্যন্ত রোবিকে বিদায় নিতে হল। আর গ্লোরিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সেদিন রবিবারের দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আয়েস করে খবরের কাগজ নিয়ে বসে ছিলেন গ্লোরিয়ার বাবা জর্জ ওয়েস্টন। হঠাৎ গ্লোরিয়ার মা গ্রেস এসে ঘরে ঢুকলেন। দু-এক মিনিট ধরে তাঁকে নিঃশব্দে লক্ষ করার পর তিনি ফেটে পড়লেন, "কাগজটা দয়া করে সরিয়ে রেখে আমার দিকে তাকাবার মতো একটু ফুরসত হবে কি?"

বিব্রতভাবে কাগজটা মেঝেয় ফেলে দিয়ে জর্জ ওয়েস্টন বললেন, "কেন? কী হয়েছে? কিছু বলবে কি?"

"তুমি ভাল করেই জানো, কী বলব? ওই ভয়ানক মেশিন আর গ্লোরিয়া····।"

"ভয়ানক মেশিন? কেন?"

"না-জানার ভান কোরো না। ওই রোবটটা—গ্লোরিয়া যাকে রোবি বলে ডাকে···ওটাকে ছেড়ে মেয়েটা এক মুহূর্ত থাকতে চায় না। আমার সাফকথা, একটা মেশিনের ওপর মেয়ে মানুষ করার ভার ছেড়ে দিয়ে আমি বসে থাকতে পারব না।"

বিরক্তিতে গ্লোরিয়ার বাবার কপাল কুঁচকে

উঠল, "কবে থেকে তুমি আবার এইসব ভাবা শুরু করলে ?"

"প্রথম প্রথম ব্যাপারটা নতুন ছিল। আমার কাজও যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। তা ছাড়া রোবট রাখাটা ছিল একটা ফ্যাশান। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি···আর পাড়াপড়শিরা···।"

"এর মধ্যে পাড়াপড়শিরা আবার কেমন করে ঢুকে পড়ল ? দ্যাখো গ্রেস, মানুষের চেয়ে একটা রোবটের ওপর কোটি গুণ বেশি ভরসা করা যায়। রোবিকে একটাই মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল—সে যাতে ছোটদের সঙ্গী হয়ে উঠতে পারে। ওর গোটা মনটাই ওইভাবে তৈরি করা হয়েছে। এখন বিশ্বস্ত হওয়া ছাড়া ওর অন্য কোনও উপায় নেই।"

"কিন্তু, ধরো, ওর ভেতরকার কলকব্জা যদি কিছু খারাপ হয়ে যায় ?"

"আবার বাজে কথা। যে-কোনও রোবটের পক্ষে রোবট শাস্ত্রের প্রথম সূত্র ভাঙা অসম্ভব। নিয়মটা হচ্ছে, কোনও রোবট কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। এমন যদি কোনও অবস্থার সৃষ্টিও হয় তবে সেই মুহূর্তে রোবটটা অচল হয়ে পড়বে।"

"আমার ওসব বড়-বড় কথা বোঝার কোনও দরকার নেই। মেয়েটা তার সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিশতেই চায় না। দিন-রাত রোবটটাকে নিয়ে পড়ে রয়েছে। মেশিনটাকে দূর করো। আমি কম্পানির সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা ওকে ফেরত নিতে রাজি আছে।"

"কথা বলেছ ! বাঃ। কিন্তু, শুনে রাখো, গ্রেস। গ্লোরিয়া বড় হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত রোবটটা এখানেই থাকবে। এসব ছেঁদো কথা নিয়ে আমাকে আর কখনও বিরক্ত কোরো না ?" কড়াভাবে কথাগুলো বলে জর্জ স্ত্রীর হাত থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিলেন।

কিন্তু জর্জ ওয়েস্টন যতই দৃঢ় হওয়ার চেষ্টা করুন না কেন প্রতিদিন তিনি স্ত্রীর কাছে একই অভিযোগ শুনতে শুনতে ক্রমশই তিতি-বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। শেষে একদিন তিনি গ্রেসকে বললেন, "বেশ, তাই হবে। দয়া করে আমাকে একটু শান্তি দাও।"

সেদিন গ্লোরিয়ার বাবা গ্লোরিয়াকে বললেন, "চল, একটা ভাল সিনেমা এসেছে, দেখে আসি।"

"কী মজা ! রোবি যাবে কি ?"

"না, মা। ওকে ঢুকতে দেবে না। তুই বরং ফিরে এসে ওকে গল্পটা শোনাস।"

গ্লোরিয়া রাজি হয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে গল্পটা রোবিকে বলার জন্য যেন পাগল হয়ে উঠেছিল গ্লোরিয়া। গাড়িটা বাড়ি পৌঁছতেই সে গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল। কিন্তু সেখানে একটা সুন্দর কুকুরছানা দেখে তাকে থামতে হল।

"কী সুন্দর কুকুর !" বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করল গ্লোরিয়া।

জর্জ বললেন, "এটা তোমার। তোমার সঙ্গে খেলা করবে।"

"সত্যি !" খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠে গ্লোরিয়া বলল, "আমি তবে এটা রোবিকে দেখিয়ে আসি। ওরও খুব মজা হবে, রোবি—রোবি !" রোবির কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে গ্লোরিয়া বলল, "দেখেছ, বাবা। সিনেমায় নিয়ে যাইনি বলে ওর রাগ হয়েছে। ঘরে বসে রয়েছে অথচ সাড়া দিচ্ছে না। যাই, ওর রাগ ভাঙাই গিয়ে।" কুকুরছানাটাকে কোলে নিয়ে দুদ্দাড় করে ওপরে ছুটল গ্লোরিয়া।

জর্জ ওয়েস্টন স্ত্রীর দিকে তাকাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গ্রেস ওয়েস্টন তাঁর মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

একটু পরেই গ্লোরিয়া উত্তেজিত হয়ে ফিরে এল, "বাবা-বাবা, রোবি তো ঘরে নেই, কোথায় গেছে ?"

জর্জ ওয়েস্টন আর ব্যাপারটাকে লুকিয়ে রাখা ঠিক বলে মনে করলেন না। মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, "রোবি চলে গেছে। ওর অনেক খোঁজ করা হয়েছে। পাওয়া যায়নি।"

আঁতকে উঠল যেন গ্লোরিয়া, "রোবি চলে গেছে ! আর কখনও ফিরবে না ?"

"আমরা খোঁজ করছি মা। নিশ্চয় খুব তাড়াতাড়ি ওর খোঁজ পেয়ে যাব। ততদিন তুমি এই কুকুরছানাটা নিয়েই খেলা করো।"

"চাই না এই নোংরা কুকুরছানা।" দুম করে বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে গ্লোরিয়া ভীষণ জোরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, "রোবি। আমার রোবিকে চাই। ওকে ফিরিয়ে আনো, বাবা।"

গ্রেস ওয়েস্টন মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "একটা মেশিনের জন্য বোকার মতো কাঁদছ কেন ? রোবি তো মেশিন ছাড়া

আর কিছু নয়।"

দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে গ্লোরিয়া বলল, "না। ও মেশিন নয়। ও আমার বন্ধু। আমার রোবিকে ফিরিয়ে আনো মা।"

গ্লোরিয়ার কান্না কিছুতেই থামাতে না পেরে গ্রেস ওয়েস্টন বিরক্ত হয়ে স্বামীকে বললেন, "ছেড়ে দাও। কাঁদুক ও। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সময় কিন্তু প্রমাণ করল, গ্রেস ওয়েস্টন তাঁর মেয়ের সম্পর্কে একটু বেশি আশাবাদী। গ্লোরিয়ার কান্না থামল বটে, কিন্তু, তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। দিনের পর দিন সে হাসি-ঠাট্টা ভুলে যেন মনমরা মতো হয়ে উঠল। তাই শেষ পর্যন্ত গ্লোরিয়ার ব্যাপারে স্বামীর কাছে হার মানতে হল গ্রেসকে।

একদিন সন্ধেবেলায় ঘরে বসে জর্জ ওয়েস্টন খবরের কাগজ পড়ছিলেন, সেই সময় গ্রেস ওয়েস্টন ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল।

জর্জ ওয়েস্টন হাতেধরা কাগজটার ওপর দিয়ে উঁকি মেরে প্রশ্ন করলেন, "কী হল? এত উত্তেজিত কেন?"

"তোমার মেয়ে···আমায় পাগল করে দেবে। আজ কুকুরছানাটাকে বিদেয় করলাম। গ্লোরিয়া ওটার ছায়া দেখলে খেপে যাচ্ছে।"

খবরের কাগজে মুখটা আড়াল করে জর্জ ওয়েস্টন বললেন, "আমাদের উচিত রোবিকে ফিরিয়ে আনা। আমি···।"

গ্রেস ওয়েস্টন ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "কখনও-ই নয়। একটা রোবট একটা শিশুকে মানুষ করবে, ভাবাই যায় না। তার চেয়ে রোবিকে ভুলবার জন্য গ্লোরিয়ার যদি বছরের পর বছর সময় লেগে যায়, তাও ভাল।"

জর্জ বললেন, "কিন্তু এক বছরেই তো আমার মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে যাবার জোগাড়!"

গ্রেস বললেন, "দ্যাখো, আসলে গ্লোরিয়ার যা দরকার, তা হচ্ছে জায়গাটার পরিবর্তন। এখানকার সব কিছুর সঙ্গে রোবির স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, ভুলবেটা কেমন করে?"

"তার মানে তুমি এখন জায়গা বদলের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ, এই অগস্টেই আমরা নিউ ইয়র্কে যাব।"

"নিউ ইয়র্ক, এই সময়ে অসহ্য।"

"যতই অসহ্য হোক, তোমার আরামের চেয়ে মেয়ের স্বাস্থ্যটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ও একমাসে পাঁচ পাউণ্ড ওজন হারিয়েছে, তা কি জানো?"

নিউ ইয়র্ক যাবার কথা শোনার পর থেকেই আশ্চর্যজনকভাবে গ্লোরিয়ার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটতে থাকল। তারপর যেদিন তারা সত্যিই গাড়িতে চড়ে বসল, সেদিন তার খুশির সীমা রইল না। নিউ ইয়র্ক কখন পৌঁছবে এই চিন্তায় গ্লোরিয়া ছটফট করতে থাকল। শেষ পর্যন্ত সে আর ধৈর্য ধরতে পারল না। মাকে বলল, "আমি জানি, কেন আমরা নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি।"

"কেন বলো তো?"

"ওখানে গেলে ডিটেকটিভ দিয়ে রোবিকে খুঁজে বার করার সুবিধে হবে। আমাকে চমকে দেবে বলেই কথাটা তোমরা আগে জানাওনি। তাই না, মা?"

জর্জ ওয়েস্টন জল খাচ্ছিলেন। গ্লোরিয়ার কথাগুলো তাঁর কানে যেতেই তিনি ভীষণভাবে বিষম খেয়ে চোখ-মুখ লাল করে ফেললেন।

গ্রেস ওয়েস্টন বিব্রত হয়ে শেষ পর্যন্ত গলার স্বর নরম করে বললেন, "হ্যাঁ, তাই। তুমি এখন চুপ করে বসে থাকো। আমায় জ্বালিও না।"

প্রায় মাসখানেক ধরে ওয়েস্টন পরিবার নিউ ইয়র্কের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো দেখে ঘুরেফিরে বেড়ালেন। তাঁদের সঙ্গে গ্লোরিয়াও খুশিমনে ঘোরাঘুরি করল। গ্লোরিয়াকে খুশি হতে দেখে জর্জ আর গ্রেস ওয়েস্টন ভাবা শুরু করলেন যে, গ্লোরিয়া নিশ্চয় রোবিকে ভুলতে বসেছে।

আসলে ঘটনাটা তা নয়। গ্লোরিয়া যেখানেই যায় সেখানেই সে কোনও রোবট দেখা মাত্র দাঁড়িয়ে পড়ে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দ্যাখে। সেই রোবটটা আসলে রোবি কি না। এই ব্যাপারটা লক্ষ করার পর থেকেই গ্রেস ওয়েস্টন মেয়েকে রোবট মাত্রেরই ছায়া থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে থাকলেন।

তবু, ব্যাপারটা চরমে উঠল একদিন। তাঁরা 'মিউজিয়াম অব সায়েন্সে' শিশুদের জন্য আয়োজন করা এক প্রদর্শনী দেখতে

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটিও পাখি নেই

গত সংখ্যায় আঁকার পাতায় ত্রিভুজ এবং বৃত্ত ছড়িয়ে ছিল বেশ কয়েকটি। তোমাদের ভাবতে বলেছিলাম। তোমাদের ভাবনা মিলেছে কি না এবারের আঁকার পাতা দেখে নাও। একটিও পাখি নেই কিন্তু, রয়েছে কয়েকটি কুকুর।

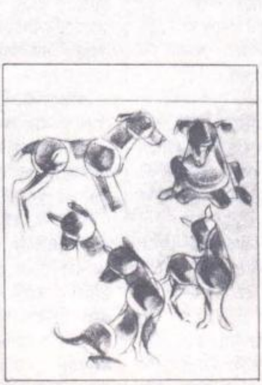

হাসিখুশি — শতদল

দিদিমণি "এমন পাঁচটা জিনিসের নাম করো লালু, যার মধ্যে দুধ আছে!"
লালু; "ঘি, মাখন, ছানা আর দুটো গোরু।"

দিদিমণি, "বুবুন, ধরো একজন লোক তোমাকে ১০০ টাকা দিল, আর তারপরেই সে মারা গেল, তা হলে তুমি কী করবে? তুমি নিশ্চয় তার আত্মার শান্তি কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাবে?"
বুবুন, "আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলব, যেন ওইরকম আর একজন লোকের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হয়।"

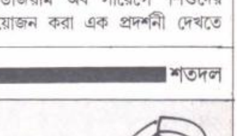

দিদিমণি, "বলো তো আকাশে আমরা যে বিদ্যুৎ দেখি, আর আমরা প্রতিদিন যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি—এই দুই ধরনের বিদ্যুতের মধ্যে কী তফাত?"
ছাত্র "আকাশে যে বিদ্যুৎ দেখতে পাই তার জন্য আকাশকে কোনও পয়সা দিতে হয় না।"

ছবি: কৃষ্ণেন্দু চাকী

গেলেন। সেখানে কথা-বলতে-পারা একটা রোবটকে দেখে গ্লোরিয়া ফেটে পড়ল, "আমার রোবিকে খুঁজে বার করে দাও মা।"

ভীষণ বিরক্ত হয়ে গ্রেস ওয়েস্টন শেষ পর্যন্ত বাসায় ফিরে এলেন।

মিউজিয়ামের ঘটনার পর হাল ছেড়ে দিয়ে বসে ছিলেন গ্রেস ওয়েস্টন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই জর্জ ওয়েস্টন একটা নতুন পরিকল্পনা হাজির করলেন। তিনি বললেন, "দ্যাখো, আসলে গ্লোরিয়া রোবিকে আরও পাঁচজন মানুষের মতো বলে ভাবে। তাই ও রোবিকে ভুলতে পারছে না। তাই মনে করেছি, ওকে নিয়ে আমরা 'ইউ এস রোবটস অ্যাণ্ড মেকানিক্যাল মেন কর্পোরেশনে' যাব। ওখানে রোবট তৈরি করা হয়। ওখানকার সব কিছু দেখার পর নিশ্চয় ওর ভুল ভেঙে যাবে। ও নিশ্চয় তখন বুঝতে পারবে যে রোবটরা আসলে যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ওর মধ্যে এই বোধটুকু তৈরি করতে পারলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।"

কোনও রকম উৎসাহ না দেখিয়ে গ্রেস ওয়েস্টন বললেন, "শুনে তো বুদ্ধিটা ভাল বলেই মনে হচ্ছে, দ্যাখো, কী হয়!"

ম্যানেজার স্ট্রুথারস সবাইকে কারখানাটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। এখানে-সেখানে অজস্র রোবট। কিন্তু গ্লোরিয়া তাদের খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ক্রমশই হতাশ হচ্ছিল। না! কেউই রোবির মতো নয়। ক্রমে সে বিরক্ত বোধ করতে লাগল।

এক সময়ে সকলে মিলে একটা বড় হলঘরে এসে হাজির হলেন। আলোয় উজ্জ্বল ঘরটা নানান ধাতব শব্দে সব সময় গমগম করছে। স্ট্রুথারস বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, "এই যে, জায়গাটা দেখছেন, এখানকার কাজকর্ম সব রোবটেরাই করে। নাম কা ওয়াস্তে পাঁচজন মানুষ সুপারভাইজার অবশ্য রয়েছে কিন্তু তারা ঘরের বাইরেই থাকে। অথচ গত পাঁচ বছরে এখানে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।"

ম্যানেজারের কথা গ্লোরিয়ার কানে ঢুকছিল না মোটেই। সে লক্ষ করছিল, একটু দূরে একটা টেবিল ঘিরে পাঁচ-সাতজন রোবট কাজ করছিল···তাদের মধ্যে একজন যেন···রোবি···হ্যাঁ, রোবিই তো! চিৎকার করে উঠল গ্লোরিয়া, "রোবি!"

রোবটগুলোর মধ্যে একজনের হাত থেকে একটা যন্ত্র মাটিতে পড়ে গেল। সে যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গ্লোরিয়ার দিকে তাকাল।

বাবা-মা বা অন্য কেউ বাধা দেওয়ার আগেই গ্লোরিয়া আনন্দে পাগল হয়ে ছুটে গেল। সামনে লোহার একটা রেলিং ছিল। রেলিংটা টপকে সে ভেতরে নেমে পড়ল। গ্লোরিয়ার হাত দুটো সামনে বাড়ানো। মাথার চুল উড়ছে।

ঘরের অন্য তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আতঙ্কে হিম হয়ে গিয়ে লক্ষ করল, গ্লোরিয়াকে লক্ষ্য করে একটা বিশাল ক্রেন অন্ধের মতো নেমে আসছে অথচ গ্লোরিয়ার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে জ্ঞানহারা অবস্থায় ছুটে যাচ্ছে।

পলকের মধ্যে জর্জ ওয়েস্টন বুঝতে পারলেন যে, ছুটে গিয়েও গ্লোরিয়াকে আর বাঁচানো সম্ভব নয়। তবু তিনি রেলিং পার

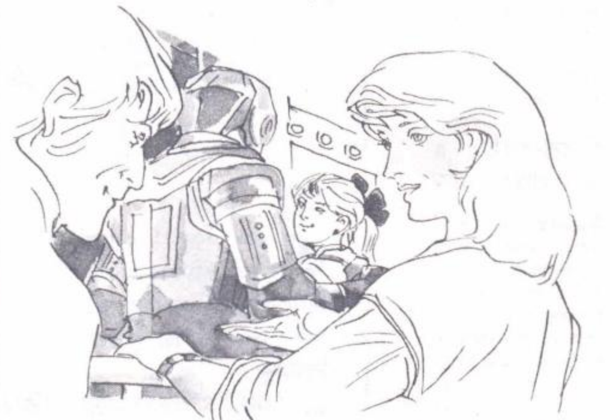

হয়ে ছুটে গেলেন।

ম্যানেজার স্ট্রুথারস পাগলের মতো চিৎকার করে তাঁর সুপারভাইজারদের বললেন, ক্রেনটা থামাতে। কিন্তু, তারা তো মানুষ—প্রতিক্রিয়ার জবাবে সাড়া দিতে সময় লাগে।

একমাত্র রোবিই সেই চিৎকারে সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠল, অবিশ্বাস্যগতিতে উলটো দিক থেকে সে ছুটে এসে গ্লোরিয়াকে যেন ছোঁ মেরে সরিয়ে নিয়ে গেল। মুহূর্তের ভগ্নাংশ সময় আগে গ্লোরিয়া যেখানে ছিল ঠিক সেইখানে ক্রেনটা আছড়ে পড়ল।

বিহ্বলতা কেটে যেতেই জর্জ আর গ্রেস ওয়েস্টন ছুটে গ্লোরিয়ার কাছে পৌঁছে গেলেন। গ্লোরিয়ার কিন্তু তখনও এইসব ব্যাপারে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে পরমানন্দে রোবির গলা আঁকড়ে ধরে রয়েছে। রোবি যদি যন্ত্র না হয়ে মানুষ হত, তা হলে বোধ হয় গ্লোরিয়ার হাতের চাপে সে দম বন্ধ হয়ে মারা যেত।

সব কিছু লক্ষ করার পর গ্রেস ওয়েস্টনের মুখে সন্দেহের ছায়া জাগল। তিনি স্বামীকে বললেন, "এটা তোমার সাজানো ব্যাপার, তাই না? এখানে নিয়ে এসেছিলে যাতে গ্লোরিয়া রোবিকে খুঁজে পায়, তাই তো? আমার এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আছে যে, রোবিকে যখন এঞ্জিনিয়ারিং কাজকর্ম করার জন্য তৈরি করা হয়নি, তখন তার ওই টেবিলে থাকাটার অন্য কোনও অর্থ হয় না।"

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জর্জ ওয়েস্টন বললেন, "হ্যাঁ, তা সত্যি কথা ঠিকই, কিন্তু এমন যে একটা ভয়ানক ঘটনার মধ্যে দিয়ে গ্লোরিয়া তার বন্ধুকে খুঁজে পাবে তা কী করে জানব আগে থেকে? যাই হোক না কেন, রোবি গ্লোরিয়ার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তুমি এখন আর ওকে ফেরত পাঠাতে পারবে না।"

গ্রেস ওয়েস্টন গ্লোরিয়া-রোবিকে ভাল করে দেখলেন। গ্লোরিয়া তখনও খুব শক্ত করে রোবির গলা জড়িয়ে ধরে হাঁপাচ্ছে। অন্যদিকে রোবির যে-হাত দুই ইঞ্চি পুরু কঠিনতম ইস্পাতের রডকেও দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেলতে পারে, সেই শক্তিশালী হাত দুটো আশ্চর্যরকম আলতোভাবে গ্লোরিয়াকে জড়িয়ে রেখেছে। উত্তেজনায় রোবির চোখ দুটো হয়ে উঠেছে ঘন লাল।

গ্লোরিয়ার মা অর্থাৎ, গ্রেস ওয়েস্টন শেষ পর্যন্ত বললেন, "বেশ, ঠিক আছে। থাকুক ও। যতদিন পর্যন্ত রোবি মরচে ধরে নষ্ট না হয়ে যাচ্ছে, ততদিন ও আমাদের কাছেই থাকতে পারে।"

অনুবাদ : অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

জেভিয়ার লেবার রিলেশনস ইনস্টিটিউট

ব্যবস্থাপনা নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য যে কয়েকটি নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে তাদের মধ্যে জামশেদপুরের জেভিয়ার লেবার রিলেশনস ইনস্টিটিউট একটি। এই ইনস্টিটিউট দু' বছরের পুরো সময়ের এবং তিন বছরের আংশিক সময়ের ব্যবসা-ব্যবস্থাপনা এবং দু' বছরের কর্মী-ব্যবস্থাপনা ও শিল্প-সম্পর্ক বিষয়ক কোর্স পড়ান। সরকার এইসব স্নাতকোত্তর কোর্সকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ব্যবস্থাপনা শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে এই বিষয়ে গবেষণার সুযোগও রয়েছে এখানে।

ব্যবসা-ব্যবস্থাপনার স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ ব্যবসা-ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দুটি পাঠক্রম রয়েছে এখানে। একটি পাঠক্রম দিনে, এবং অন্যটি সন্ধেবেলায় পড়ানো হয়। এই দুটি পাঠক্রমের সফল শিক্ষার্থীদের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা অর্থাৎ পি জি ডি বি এম দেওয়া হয়। এই পাঠক্রমের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া যাতে তিনি ভবিষ্যতে ব্যবসার ক্ষেত্রে কিংবা সরকারি সংস্থায় একজন সফল ব্যবস্থাপক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ, তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা—এই তিনটি দিকেই নজর দেওয়া হয়।
দু' বছরের এই শিক্ষাক্রমকে পড়াশোনার সুবিধের জন্য ছ'টি টার্মে এবং তিন বছরের পার্ট টাইম কোর্সের ক্ষেত্রে ন'টি টার্মে ভাগ করে নেওয়া হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বিভিন্ন উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। গ্রীষ্মের ছুটিতে দিনের বেলার ছাত্রদের বাণিজ্য-সংস্থায় কোনও প্রোজেক্টের ওপর কাজ করতে হয়। এইভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা সংস্থা পরিচালনায় নানা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পান।

কর্মী পরিচালনা ও শিল্প সম্পর্কিত স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

দু' বছরের পার্সোনেল ম্যানেজমেন্টের আবাসিক কোর্স শেষ করার পর সফল শিক্ষার্থীকে ডিপ্লোমা ইন পি এম অ্যান্ড আই আর দেওয়া হয়। এই পাঠক্রম এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে শিক্ষার্থী পাশ করার পর স্বাধীনভাবে কোনও সংস্থা পরিচালনা এবং সেই সংস্থার কর্মীদের সমস্যা মেটাতে পারেন। এই শিক্ষাক্রমের ছাত্র-ছাত্রীরা অর্থনীতি, সমাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, যোগাযোগ, আইন, সংখ্যাতত্ত্ব সব বিষয়েই দক্ষ হয়ে ওঠেন, কেননা তাঁদের মানুষ নিয়ে কাজকর্ম করতে হয়। সংস্থার হিসেবনিকেশ, আয়ের উৎস, উৎপাদন, বিপণন, বাণিজ্যিক নীতি সব বিষয়েই ব্যবস্থাপককে সতর্ক থাকতে হয়।
গরমের ছুটিতে এই পাঠক্রমের শিক্ষার্থীদেরও কোনও বাণিজ্যিক কিংবা ব্যবসা উদ্যোগ সংস্থায় শ্রম সম্পর্কিত প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হয়। এভাবেই শ্রমিক সংগঠন, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে তোলেন।

ব্যবস্থাপনা-বিদ্যায় ফেলো পাঠক্রম

জেভিয়ার ইনস্টিটিউটের ফেলো পাঠক্রম অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি-র সমতুল। এই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য সফল শিক্ষার্থীর জিজ্ঞাসু মনের বিকাশ ঘটানো। ঘরে বসে কোর্স ওয়ার্ক

এ-দেশে ব্যবস্থাপনা নিয়ে পড়াশোনার জন্য নামী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। তাদেরই একটি হল জামশেদপুরের জেভিয়ার লেবার রিলেশনস ইনস্টিটিউট। এখানে পড়াশোনার প্রধান কয়েকটি নিয়মকানুন :

(১) এই ইনস্টিটিউটে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কিংবা পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট পড়তে হলে শতকরা অন্তত ৫০ নম্বর পেয়ে স্নাতক হতে হবে।

(২) স্নাতকোত্তর প্রার্থীরাও ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। সে-ক্ষেত্রে তাঁদেরও শতকরা অন্তত ৫০ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে।

(৩) শিক্ষাবর্ষ তিনটি টার্ম-এ বিভক্ত। জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি থেকে মার্চ।

(৪) ফেলো প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী মাসে ১৫০০ টাকা হিসেবে স্টাইপেণ্ড পেতে পারেন। তবে, সব মিলিয়ে চার বছরের জন্য।

(৫) ইনস্টিটিউটের আছে নিজস্ব প্লেসমেন্ট ব্যুরো। এই ব্যুরো বিভিন্ন নিয়োগসংস্থা এবং ছাত্রদের মধ্যে যোগাযোগ করে দেন।

করা যেতে পারে, কিন্তু কোন বিষয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক সে-ব্যাপারে ইনস্টিটিউটের অনুমোদন নিতে হবে। দু' বছরের শেষে পরীক্ষায় বসতে হবে এবং ইনস্টিটিউটের একজন বিশেষজ্ঞের অধীনে গবেষণার কাজ শেষ করতে হবে। সাধারণত দু' বছর সময়ের মধ্যে এই কাজ শেষ করার কথা। ফেলো পাঠক্রম চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থী মাসে দেড় হাজার টাকা পান। তবে চার বছরের বেশি বৃত্তি মঞ্জুর করা হয় না।

পড়াশোনার খরচ

ব্যবসা-ব্যবস্থাপনা কিংবা কর্মী-প্রশাসন ও শিল্প সম্পর্কিত স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে প্রথম বছরে ভর্তি ফি, মাসিক বেতন ইত্যাদি মিলিয়ে লাগে ২৫০০ টাকা এবং লাইব্রেরি ডিপোজিট দিতে হয় ২০০ টাকা। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কিস্তিতে দিতে হয় ২৭৫০ টাকা এবং চতুর্থ কিস্তিতে লাগে ২৭০০ টাকা। ফেলো পাঠক্রমের ক্ষেত্রে প্রথম বছর ৮০০ টাকা, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছর ৫০০ টাকা এবং চতুর্থ বছরে ৮০০ টাকা জমা দিতে হয়। পড়াশোনার খরচ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার আলাদা খরচ লাগে। এখানকার শিক্ষার্থীদের জন্য ছেলেমেয়েদের আলাদা-আলাদা ছাত্রাবাস রয়েছে।

আর্থিক সহায়তা

দিনের বেলার ছাত্র-ছাত্রী, যাঁরা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কিংবা পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাঁদের মধ্যে মেধাবী দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বছর কিছু স্কলারশিপ দেওয়া হয়। এ ছাড়া যেসব ছাত্র-ছাত্রী রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে পড়াশোনা শেষ করতে চান, তাঁরা রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় এক হাজার টাকার বেশি হলে তিনি এই সুযোগ পাবেন না।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে

ইনস্টিটিউটের সফল শিক্ষার্থীদের জন্য প্লেসমেন্ট ব্যুরো বা নিয়োগ সহায়তা কেন্দ্র আছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যাঁরা দক্ষ পরিচালক বা প্রশাসক চান তাঁদের সঙ্গে ছাত্রদের যোগাযোগ করিয়ে দেন এই ব্যুরো। নিয়োগের এই সুযোগ ছাড়াও ছাত্রাবস্থায় খেলাধুলো, আমোদ প্রমোদ এবং চিকিৎসার নানা ব্যবস্থা আছে এখানে।
ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা দেখাশোনার জন্য আছে স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিল। ছাত্রদের উদ্যোগে ক্যাম্পাসের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয় বিতর্কসভা, নাটক, বার্ষিক মিলনসভা। তা ছাড়া স্পিকিং ক্লাব, ফিল্ম ক্লাব, গ্লি হাইভ, থিয়েটার সার্কেল তো আছেই! ছাত্রদের উদ্যোগে পাঠচক্রের সুন্দর ব্যবস্থাও আছে।
দেশের ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার ঘাটতি পূরণ এবং আদর্শ শিক্ষাক্রম চালু করার জন্য এই ইনস্টিটিউট নানাভাবে কাজ করে চলেছে। আর এজন্য তারা পরিচালনা করছে সেন্টার ফর এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড রিসার্চ, সেন্টার ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভেলাপমেন্ট। স্বল্প সময়ের নানা ট্রেনিংয়েরও তাঁরা ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন সংস্থার প্রশাসনিক কাজকর্মের আধুনিকীকরণে সহায়তা করার জন্য তাঁরা 'ইন-কম্পানি' ট্রেনিংয়ের কার্যক্রম চালু করেছেন। সর্বোপরি তাঁদের কনসালটেন্সি বিভাগ রয়েছে। সফল শিক্ষার্থীদের সাফল্য অনুসারে ইনস্টিটিউট নানা পুরস্কার দিয়ে থাকেন। আর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সফল ছাত্র-ছাত্রীদের ডিপ্লোমা দেওয়ার ব্যবস্থা তো আছেই!

কীভাবে ভর্তি হবেন

স্নাতকোত্তর বিভিন্ন পাঠক্রমে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে কমপক্ষে এগ্রিগেটে শতকরা ৫০ নম্বর সহ স্নাতক হতে হবে (১০+২+৩ পর্যায়ে)। যাঁরা এম-এ/এম এসসি/এম-কম বা কোনও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পরীক্ষায় পাশ করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকা চাই। তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নম্বরের হার হবে ৪০ শতাংশ। তবে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যাঁরা ভর্তি হতে চান, তাঁদের উচ্চ মাধ্যমিকে ম্যাথমেটিক্স থাকা চাই। ফেলো পাঠক্রমে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে এম বি এ অথবা দু' বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ বি ই হতে হবে। এ ছাড়া ৫০ শতাংশ নম্বরসহ মাস্টার ডিগ্রি পরীক্ষায় (তফসিলি ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ) পাশ করে থাকলেও আবেদন করা যাবে।

যেসব প্রার্থী যোগ্য বিবেচিত হবেন, তাঁদের লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে। পরীক্ষা-কেন্দ্র রয়েছে দেশ জুড়ে' বাঙ্গালোর, ভোপাল, ভুবনেশ্বর, বোম্বাই, কলকাতা, গুয়াহাটি, জামশেদপুর, পাটনা ইত্যাদি বড়-বড় শহরে। তফসিলি প্রার্থীদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষিত আছে।
ভর্তির আবেদনপত্র এবং নিয়মাবলী পেতে হলে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, এক্স এল আর আই শাখা কিংবা জামশেদপুর শাখার ওপর কাটা চল্লিশ টাকায় রেখিত ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠাতে হবে অ্যাডমিশনস কো-অর্ডিনেটর, জেভিয়ার লেবার রিলেশনস ইনস্টিটিউট, জামশেদপুর-৮৩১ ০০১ ঠিকানায়। পূরণ করা ফর্ম জমা দেওয়ার সময় রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৬০ টাকার (তফসিলি ক্ষেত্রে ৩০ টাকা) ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠাতে হয়। কোর্স শুরু জুলাই মাসে।

পড়ানো হয় কোন পদ্ধতিতে

শুধু পাঠ্যবইই নয়, হাতে-কলমে শেখানোর নানারকম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় জামশেদপুরের জেভিয়ার লেবার রিলেশনস ইনস্টিটিউটে। ক্লাসে বসে পড়ানো, সেমিনার, দলবদ্ধ আলোচনা, ল্যাবরেটরিতে শেখানো ইত্যাদি সব-কিছুরই ব্যবস্থা আছে। বাস্তবজ্ঞান অর্জনের জন্য শিল্পসংস্থায় কাজ শেখানোও আছে এর মধ্যে। এ ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধের জন্য আছে কম্পিউটার সেন্টার। ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিটি প্রয়োজনীয় বইপত্রে সমৃদ্ধ। খোলা থাকে সকাল আটটা থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত। এখানে বই আছে ৩২০০০ এবং দেশী-বিদেশী পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৪০০।

ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝানোর সুবিধের জন্য অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া হয়, যেমন, ওভারহেড প্রোজেক্টর, স্লাইড প্রোজেক্টর, মুভি প্রোজেক্টর এবং সাউন্ড সিস্টেম, সর্বোপরি ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশনও আছে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় তথ্যে ঠাসা একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও আছে এই ইনস্টিটিউটের।

ছবি : দেবাশিস দেব

অভিযান

এস্কিমো, ইগলুদেশের পাহাড়চূড়ায়

গ্রিনল্যান্ডের তুষাররাজ্যে দুটি নতুন শৃঙ্গ জয়ের কথা লিখেছেন **অরিন্দম দেবনাথ**

রোদ-ঝলমল ১৯৮৮ সালের জুন মাসের সকাল।

'সুইডিশ-গ্রিনল্যান্ড এক্সপিডিশন-১৯৮৮'-এর ছয় সদস্যের এক অভিযাত্রী-দল স্টকহম থেকে জাহাজে, গ্রিনল্যান্ডের উদ্দেশে পাড়ি দিলেন। তাঁরা চলেছেন গ্রিনল্যান্ডের দক্ষিণ প্রান্তে, ডেনমার্ক প্রণালীর ধার ঘেঁষে, গ্রিনল্যান্ডের সর্বোচ্চ শিখর গানবর্নসফাজলড (১২২৩৬ ফুট) জয় করতে। অভিযানটি সুইডিশ-গ্রিনল্যান্ড এক্সপিডিশন নামে চিহ্নিত হলেও শুধুমাত্র সুইডেনের বাসিন্দাদের নিয়েই দল তৈরি করা হয়নি। ছ'জনের মধ্যে মাত্র দু'জন ছিলেন সুইডিশ-লারস এবং ওলসন (দলনেতা)। অন্য চারজন হলেন অস্ট্রিয়ার পুস্টার, নরওয়ের হেলগে এবং আমেরিকার জানকিনস্। ডেনমার্কের উপকূল পার হয়ে নর্থসি'র সীমানা ছাড়িয়ে, আইসল্যান্ড ও গ্রিনল্যান্ডের মাঝখানে ডেনমার্ক প্রণালীতে পৌঁছনোর একটু পরেই অভিযাত্রীরা চমকে উঠলেন সামনের দিকে তাকিয়ে। সমুদ্রের জলের ওপরে পুরু হয়ে জমে আছে সাদা বরফ। সেই বরফ ঢেউয়ের মতো তালে-তালে দুলছে।

অথচ জুন মাসে এমনটি হওয়ার কথা নয়। অভিযাত্রীদের হিসেব অনুযায়ী বরফ গলে যাওয়ার কথা আরও দিন পনেরো আগেই। তাই তাঁরা সাধারণ অথচ মজবুত ধরনের ছোট্ট একটি জলযান বেছে নিয়েছিলেন অভিযানের জন্য।

চিন্তায় পড়ে গেলেন ওলসন ও তাঁর সঙ্গীরা। অনেক চিন্তাভাবনা ও আলোচনার পর ঠিক হল, একবার আকাশপথে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে গ্রিনল্যান্ডের পূর্ব সমুদ্র উপকূল কেপ রাভেন-এ পৌঁছনোর। একবার কেপ রাভেনে পৌঁছতে পারলে সেখান থেকে তাঁরা রোজিনবার্গ হিমবাহ অতিক্রম করে পৌঁছে যেতে পারবেন গানবর্নসফাজলডে।

২২ জুন ছোট্ট একটি বিমান নিয়ে অভিযাত্রীরা আকাশপথে যাত্রা করলেন আইসল্যান্ডের আকুইরাইরি থেকে। কেপ রাভেনও বরফাবৃত, তবে অসমতল নয় বলে চেষ্টা করলে বিমানটিকে সেখানে নামানো যেতে পারে। তাই বিমানটির চাকা খুলে তার পরিবর্তে লাগানো হল স্কি। আকুইরাইরি থেকে গ্রিনল্যান্ডের কেপ রাভেনের দূরত্ব প্রায় ৪৫ কি· মি·। ২০ মিনিটের মধ্যেই বিমানটি এসে পৌঁছল কেপ রাভেনের আকাশে। কয়েকবার কেপ রাভেনের আকাশে চক্কর মেরে দক্ষতার সঙ্গে তুষারক্ষেত্রের উপর বিমানটিকে স্কি করে নামালেন পাইলট। একে-একে বিমান থেকে নামল অভিযানের সমস্ত সাজসরঞ্জাম। পাইলট বিমানটিকে নিয়ে উড়ে গেলেন আইসল্যান্ডের দিকে। বলে গেলেন রেডিও-ওয়্যারলেসে তাঁকে খবর দিলে তিনি তাঁদের এখান থেকেই আবার নিয়ে যাবেন।

অভিযাত্রীরা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন হাতে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় এমন স্লেজ। তাতেই মালপত্র বোঝাই করা হল। অভিযাত্রীরা পালা করে করে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন স্লেজটিকে। ম্যাপ ও কম্পাসের সাহায্যে বহু কষ্টে তাঁরা পৌঁছলেন গানবর্নসফাজলডের পাদদেশে।

বরফের মরু-প্রান্তর

সুইডিশ-গ্রিনল্যান্ড এক্সপিডিশন-'৮৮ দলের সৌজন্যে

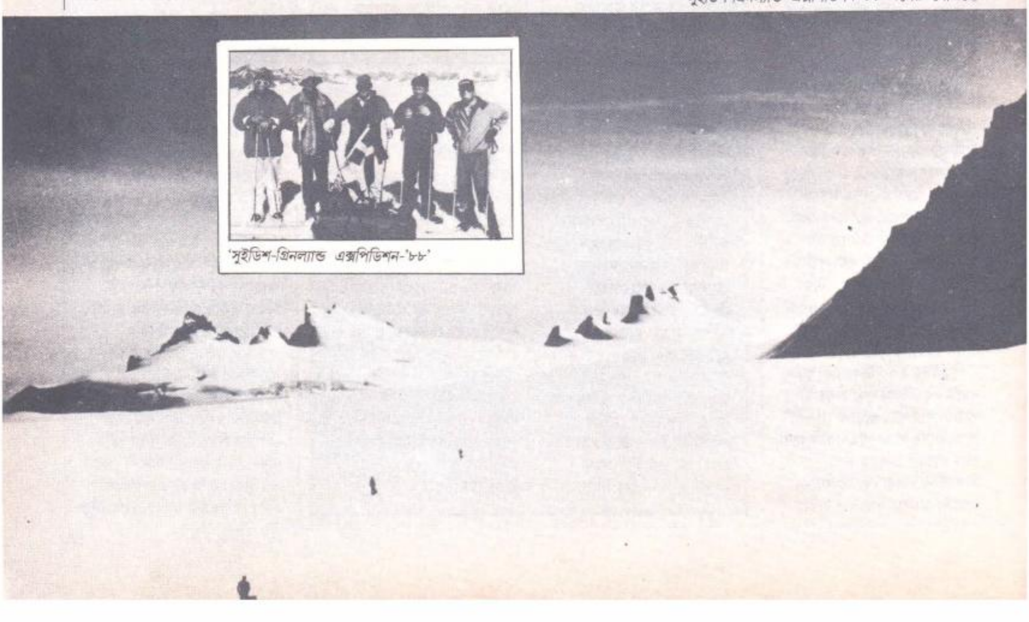

'সুইডিশ-গ্রিনল্যান্ড এক্সপিডিশন-'৮৮'

সেখানেই তাঁদের প্রথম ক্যাম্প খাটানো হল। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন তাঁরা ক্যাম্পে থেকে সুমেরু বৃত্তের ভীষণ ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিলেন। গানবর্নস-ফাজল্ডের যে গা বেয়ে তাঁরা উঠতে চান, সেই পথ ভালভাবে লক্ষ করলেন দূরবিন দিয়ে। চতুর্থ দিন ৮৯১০ ফুট উঁচুতে তাঁরা স্থাপন করলেন তাঁদের তৃতীয় শিবির। প্রবল ঝোড়ো বাতাস থেকে-থেকেই অভিযাত্রীদের বেসামাল করে দিচ্ছিল। সেসময় 'গ্যাস স্টোভ'-এ বরফ গলিয়ে তৈরি করতে হচ্ছিল পানীয়। মেরুবৃত্তের ঠাণ্ডা এতই তীব্র যে একরকম স্টোভের থেকেই ফুটন্ত জল পান করছেন অভিযাত্রীরা। কারণ স্টোভ থেকে নামানো মাত্রই ফুটন্ত জল প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাচ্ছে।

জুলাই মাসের তিন তারিখে অভিযাত্রীরা চড়লেন গ্রিনল্যান্ডের সর্বোচ্চ শিখরে, গানবর্নসফাজলডের চূড়ায়। অভিযাত্রীরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন পৃথিবীর সবচেয়ে নির্জন এবং অজানা গ্রিনল্যান্ডের একটি অংশ। কিন্তু সহসা অভিযাত্রীদের চোখে পড়ল গানবর্নসফাজলডের পাশাপাশি আরও দুটো শৃঙ্গ। গানবর্নসের থেকেও উঁচু মনে হচ্ছে ওই শৃঙ্গ দুটিকে। সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রপাতি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মাপ নিতে লাগলেন অভিযাত্রীরা। তারপর ক্যাম্পে ফিরে এলেন।

গানবর্নসের চেয়েও উঁচু মনে হওয়া শৃঙ্গ দুটি নিয়ে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তাঁরা, এবার হিসেব কষতে শুরু করলেন। তাঁদের হিসেব অনুযায়ী ওই শৃঙ্গ দুটিই গানবর্নসের চেয়েও উঁচু।

রেডিওতে গ্রিনল্যান্ড সরকারি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হল, গানবর্নস-ফাজলড জয় করেছেন তাঁরা। আরও জানালেন, একই অঞ্চলে গানবর্নসের চেয়েও আরও উঁচু দুটি শৃঙ্গ আছে বলে তাঁরা মনে করছেন।

শুরু হল স্লেজে মালপত্র চাপিয়ে বরফের উপর দিয়ে টেনে-টেনে শিবির অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ। চিরতুষারের রাজ্যে বরফের খাদ ডিঙিয়ে, পেঙ্গুইন, সিল, সিন্ধুঘোটক আর মেরু-ভল্লুকদের সাম্রাজ্যে শৃঙ্গারোহণের চেয়ে এই কাজটি অনেক বেশি কষ্টসাধ্য ছিল।

১০ জুলাই অভিযাত্রীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে দুটি শৃঙ্গের চূড়ায় উঠলেন। উচ্চতা মাপার যন্ত্রে দেখা গেল একটির উচ্চতা ১২৫০৭ ফুট ও অন্যটির উচ্চতা ১২৪৭৪ ফুট। গ্রিনল্যান্ডের মানচিত্রে সংযোজিত হল দুটি নতুন শৃঙ্গের নাম এই অভিযানের দু'জন সদস্যের নামে। ১২৫০৭ ফুট উঁচু শৃঙ্গটির নাম রাখা হল 'লারস ফাজলড' এবং ১২৪৭৪ ফুট উঁচু শৃঙ্গটির নাম 'হেলগে ফাজলড'।

গ্রিনল্যান্ডের মেরুবৃত্তে অভিযাত্রীদের শিবির

স্টকহম বন্দর, এখান থেকেই অভিযাত্রীরা জাহাজে করে যাত্রা শুরু করেছিলেন

ফোটো : লেখক

ইমরান খান
ফোটো : উৎপল সরকার

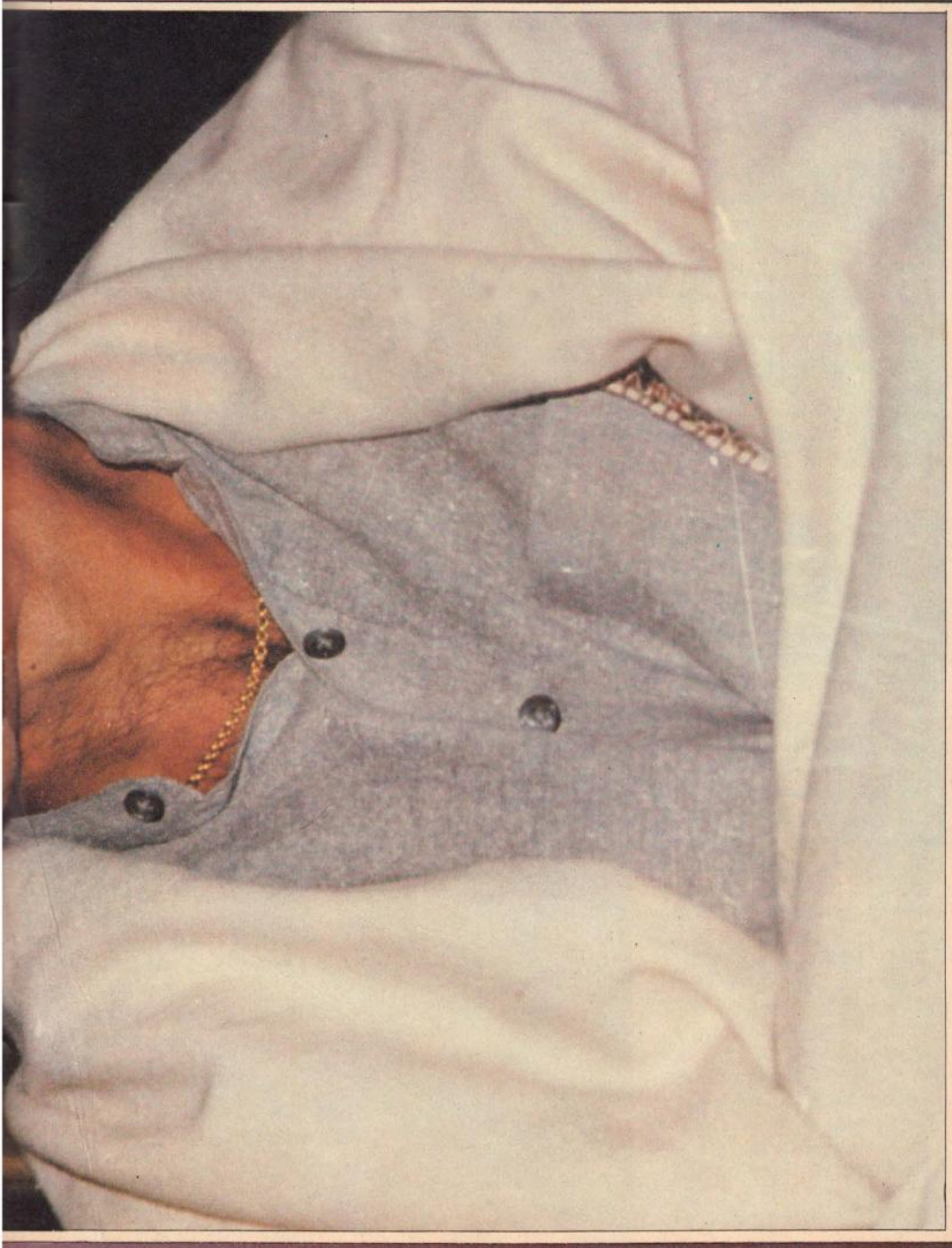

খেলাধুলো

কেমন চলছে অমৃতরাজের টেনিস-স্কুল

টেনিসে আশা জাগিয়েছেন লিয়ান্ডার পেজ। তিনি ব্রিটানিয়া অমৃতরাজ টেনিস স্কিমের ছাত্র। অমৃতরাজের এই টেনিস-স্কুল নিয়ে লিখেছেন **সমীর চৌধুরী**।

মাদ্রাজের এম আর এফ পেস ফাউন্ডেশন যেমন ফাস্ট বোলার তৈরি করছে সেরকমই টেনিস খেলোয়াড় তৈরির অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ব্রিটানিয়া অমৃতরাজ টেনিস-স্কিম। ১৯৮৫-র মে মাসে শুরু হয় এই স্কিম, সংক্ষেপে যাকে বলা হয় 'ব্যাট'। ইংরেজিতে ব্রিটানিয়া-অমৃতরাজ টেনিসের প্রথম অক্ষরগুলি জুড়ে লোকমুখে ব্যাট কথাটা চালু হয়েছে।

টেনিস-খেলোয়াড় তৈরির এই কর্মসূচির প্রধান উদ্যোক্তা হলেন বিজয় অমৃতরাজ। পাঁচ বছর আগে কর্মসূচি শুরু করার সময় বিজয় বলেছিলেন, "প্রাথমিকভাবে সাত বছরের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই পরিকল্পনায় আমাদের ধাপে-ধাপে এগোতে হবে। কেউ যেন রাতারাতি ফলের আশা না করেন।"
নির্ধারিত সাত বছর সময়-সীমার মধ্যে দেখতে-দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল। ব্যাট এই পাঁচ বছরে কতটা সফল হল তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে।

এবার জুনিয়ার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে রানার-আপ হয়েছে ব্যাটের ছাত্র লিয়ান্ডার পেজ। আগামী দিনের টেনিসে লিয়ান্ডারই ভারতের সেরা সম্ভাবনা, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।
ফোটো : রাজেশ কুমার

বিজয় অমৃতরাজ কোনও গ্রান্ড স্লাম প্রতিযোগিতা জেতেননি। তবে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রা অনেকেই তাঁর কাছে হেরেছেন। পিতা আখতার আলি এক সময় ছিলেন বিজয়ের কোচ।

রামনাথন কৃষ্ণন ১৯৫৪ সালে জুনিয়ার উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। তাঁর পুত্র রমেশের টেনিসে হাতেখড়ি কিন্তু ঠাকুরদা টি· রামনাথনের কাছে।

রমেশ কৃষ্ণন ১৯৭৯ সালে জুনিয়ার উইম্বলডন ও জুনিয়ার ফরাসি ওপেন প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হ্যারি হপম্যান-এর কাছে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন রমেশ।

করছে। কিন্তু ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমবয়সী খেলোয়াড়দের মুখোমুখি হলেই তারা সুবিধে করতে পারছে না। লিয়ান্ডার পেজ জুনিয়ার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অবশ্য খুবই ভাল করেছে। কিন্তু এই সবে তার যাত্রা শুরু। বিশ্ব টেনিসের শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড় হতে হলে তাকে এখনও বহু দূর বরিস বেকার ১৭ বছর বয়সে প্রথম উইম্বলডন জেতেন। আর, ব্যাটের প্রধান কোচ বলেছিলেন, ১৭ বা ১৮ বছর বয়সে দেশের এক নম্বর খেলোয়াড় হওয়া উচিত ব্যাটের কোনও শিক্ষার্থীর। আর, ১৯-২০ বছর বয়সে তার স্থান হবে ক্রমপর্যায় অনুযায়ী বিশ্বের ২০০ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে। ব্যাট কর্মসূচির এটাই লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবে কি দেখা যাচ্ছে ? গৌরব নাটেকর, রফি ফারুকি ও আসিফ ইসমাইলের বয়স এখন যথাক্রমে ১৭, ১৮ ও ১৯। কিন্তু এরা কেউই দেশের এক নম্বর খেলোয়াড় হয়নি। জাতীয়

প্রথম দুটি বছর কেটে যাওয়ার পর, ১৯৮৭ সালে, ব্যাটের প্রধান কোচ ডেভ ও' মিয়ারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "১৯৯০ নাগাদ ব্যাটের অন্তত দুটি ছেলে ভারতীয় ডেভিস কাপ দলে খেলবে।" ১৯৯০-এ যে এই সম্ভাবনা নেই, তা বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পেরেছেন। ব্যাটের সেরা ছাত্র যাকে বলা হচ্ছে, সেই লিয়ান্ডার পেজ এ-বছর জুনিয়ার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে রানার-আপ হলেও সে যে এবার ভারতীয় ডেভিস কাপ দলে আসবে এ-কথাটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ডেভিস কাপ দলে আসার জন্য তার আরও প্রস্তুতি দরকার।

প্রধান কোচ ও' মিয়ারা গত দু' বছর ধরে প্রায়ই একটা কথা বলছিলেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় পুরুষ খেলোয়াড়দের ব্যাটের ছেলেরা হারিয়ে দেবে। গত বছরও তিনি এই কথা বলেন। কিন্তু লিয়ান্ডার পেজ সমেত ব্যাটের আরও দুই অগ্রণী খেলোয়াড় আসিফ ইসমাইল ও গৌরব নাটেকর এখনও পর্যন্ত জিশান আলি, এনরিকো পিপার্নো, নরেন্দ্রনাথ এবং কে· জি· রমেশ-এর ধারেকাছেও আসতে পারেনি। এক-আধবার যে ব্যাটের ছেলেরা জেতেনি, তা নয়। তবে, টানা পাঁচ বছর প্রচুর খরচখরচা ও বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণের পর এটা বিরাট কৃতিত্ব বলে ধরা যায় না।

লিয়ান্ডার পেজ ও গৌরব নাটেকরের বিষয়টিও আলাদাভাবে বিচার করে দেখতে হবে। তাদের বাড়িতে আছে খেলাধুলোর ঐতিহ্য। লিয়ান্ডারের বাবা ভি পেজ ভারতীয় হকি দলের হয়ে ওলিম্পিকে খেলেছেন।

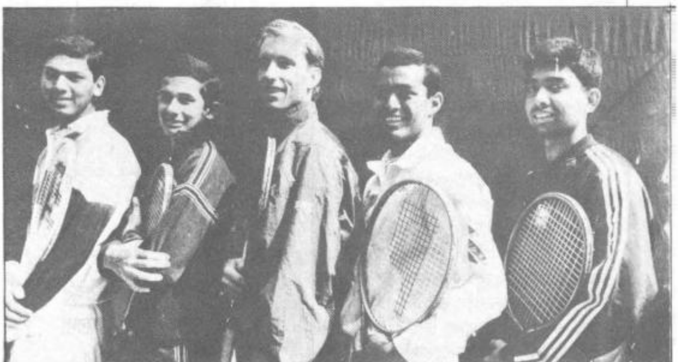

ব্যাট স্কোয়াড : বাঁ দিক থেকে আসিফ ইসমাইল, গৌরব নাটেকর, কোচ ডেভ ও'মিয়ারা, লিয়ান্ডার পেজ ও রফি ফারুকি

গৌরবের বাবা নন্দু নাটেকর এক সময়ের বিখ্যাত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। পারিবারিক ঐতিহ্য লিয়ান্ডার ও গৌরবকে নিশ্চয় কিছুটা সাহায্য করেছে। একই সঙ্গে তারা পেয়েছে ব্যাটের প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণের ফলে আসিফ ইসমাইল ও রোহিত রাজপাল গত দু' বছর এশিয়ান জুনিয়ার খেতাব পেয়েছে। কিন্তু রাজপাল যখন এশিয়ান জুনিয়ার খেতাব পায়, তখন সে ব্যাটের ছাত্র ছিল না। সে প্রশিক্ষণ পেয়েছিল তিন বছর। তারপর তাকে বাদ দেওয়া হয়।

বছর-দুয়েক ধরে ভারতীয় টেনিসের জুনিয়ার ইভেন্টগুলিতে ব্যাটের ছেলেরাই দাপট দেখাচ্ছে। এশিয়ান স্তরেও তারা ভাল

চ্যাম্পিয়ান জিশান আলিকে হারানোর ক্ষমতাও তাদের আছে কি না সন্দেহ। সম্প্রতি স্যাটেলাইট টেনিস সার্কিটে আসিফ ইসমাইল স্ট্রেট সেটে হেরেছে সুইডেনের টমাস হ্যালডিনের কাছে। বিশ্বের ক্রমপর্যায় তালিকায় হ্যালডিনের স্থান এখন ২৪৭। অথচ অনেকেই ইসমাইলকে আগামী দিনের তারকা বলে মনে করছেন।

এম আর এফ পেস ফাউন্ডেশন যেমন ডেনিস লিলিকে পেয়েছে, তেমনই ব্যাটের শিক্ষার্থীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন টেনিসের কিংবদন্তি রড লেভার। আরও বড় কথা, আছেন বিজয়। ব্যাটের কোনও খেলোয়াড় বিশ্বমানের হলে তিনিই সবচেয়ে খুশি হবেন।

তরুণ ক্রিকেটার বিনোদ কাম্বলি

শচীন তেন্ডুলকরের মতোই আশা জাগিয়েছে বিনোদ কাম্বলি । বোম্বাইয়ের এই ক্রিকেটারের অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

সেন্ট জেভিয়ার্সের বিরুদ্ধে সারদা বিদ্যাশ্রমের প্রথম উইকেট যখন পড়ল, বোর্ডে তখন রান উঠেছে ৪৮ । ক্রিজে এল বছর-পনেরো বয়সের কালো একটি ছেলে । কিছুক্ষণ পর তার সতীর্থ ব্যাটসম্যানও প্যাভিলিয়নের দিকে পা বাড়াল । তার জায়গায় মাঠে নামল ওয়ান ডাউন ব্যাটসম্যানের মতোই আর-এক কিশোর । কিন্তু সে ফরসা । এর পর প্রায় দেড়দিন ধরে এই দুই ব্যাটসম্যান সেন্ট জেভিয়ার্স বোলারদের বেধড়ক পেটাল । একশো, দু'শো তিনশো··· তৃতীয় উইকেটে রান বেড়েই চলল ।

উঠল ৬৬৪ । প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে যে-কোনও উইকেটে সর্বোচ্চ রানের বিশ্বরেকর্ড । দুজনেই ট্রিপল সেঞ্চুরি করল । কাম্বলি ৩৪৯ । শচীন ৩২৮ রান । রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনালে বোম্বাইয়ের হয়ে বাংলার বিরুদ্ধে ইডেনে খেলতে এসেছিল বিনোদ কাম্বলি, ওর সঙ্গেই এইসব কথা হচ্ছিল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ৮২২ নম্বর ঘরে । তার প্রিয় বন্ধু ষোলো বছরে পা দেওয়ার আগেই গোটাছয়েক টেস্ট ম্যাচ খেলে ফেললেও, এই মুহূর্তে শচীনের পরেই বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় বিস্ময় বালক কিন্তু বেশি মাথা ঘামাচ্ছে রাজ্য দলে জায়গা পাকা করা নিয়ে । শচীন যার প্রিয় বন্ধু সেই কাম্বলি বলল, "এই মরসুমে গুজরাতের বিরুদ্ধে প্রথম রঞ্জি ম্যাচে ৫৫ বলে ৭৪ রান করেছিলাম । প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গেও খেলেছি । কিন্তু এখনও টিমে পাকাপাকি জায়গা করে নিতে পারিনি । আগে সেটাই দরকার । ভারতের হয়ে টেস্ট খেলা পরে ।" কাম্বলি বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলে । কিন্তু বেঙ্গসরকরের কথা উঠতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "সিনিয়ার ক্রিকেটারদের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে সাহায্য করেন উনি । গুজরাত ম্যাচে বেঙ্গসরকরের সঙ্গে ব্যাট করেছিলাম । সারাক্ষণ দারুণ গাইড করেছিলেন ।" থানের কুঞ্জবার্গে কাম্বলিদের বাড়ি । বাবা থানপত কাম্বলি একটি কারখানার কর্মী । বড় ছেলে বিনোদের আগে এই গোয়ানিজ পরিবারের কেউ ক্রিকেট খেলেননি । বিনোদ কাম্বলি কিন্তু ক্রিকেটার হিসেবে গোড়া থেকেই সাড়া জাগিয়েছে, তাকে এখন তুলনা করা হচ্ছে শচীন তেণ্ডুলকরের সঙ্গে । বোম্বাইয়ের ক্রিকেট-মহলের ধারণা, দুই পার্টনারের ব্যাটিং-এ বিশেষ তফাত নেই । দু'জনের কোচই রমাকান্ত আচরেকর । শচীন-বিনোদ সারদা বিদ্যাশ্রমে পাঁচ বছর একসঙ্গে পড়ছে । ক্রিকেটের জন্যই কনভেন্ট স্কুল ছেড়ে ওরা দুজন এই স্কুলে এসেছে । এই স্কুলে ক্রিকেটের ভাল চর্চা আছে । চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, লালচাঁদ রাজপুত, প্রবীণ আমরে এই স্কুলেরই ছাত্র । রাজস্থান সি সি আই ক্লাবেও দু' বছর হল শচীন-বিনোদ একসঙ্গে খেলছে ।

বিনোদ কাম্বলি বলল, "আমরা দুজনেই ধীরে-সুস্থে ব্যাট করার পক্ষপাতী নই । আমি তবু মাঝে-মাঝে ডিফেন্সিভ স্ট্রোক নিই । কিন্তু শচীন ? বোলারদের কিছুতেই সে মাথায় চড়তে দেয় না ।" দুই বন্ধুর তফাতটা তা হলে কোথায় ? কথাবার্তায় ঝকঝকে কাম্বলির সহাস্য উত্তর, "একটাই । শচীন ডান হাতে ব্যাট করে । কিন্তু লেখালেখি করে বাঁ হাতে । আর আমি বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান । লিখি ডান হাতে ।

বিনোদের প্রিয় ক্রিকেটার সুনীল গাওস্কর । দেখা হলেই জিজ্ঞেস করেন, "শচীন-বিনোদ জুটির টেস্টে বিশ্বরেকর্ডটা কবে দেখতে পাব ?"

টেস্ট সুযোগের অপেক্ষায় আছেন বিনোদ কাম্বলি

ফোটো : রাসবিহারী দাস

আলির চোখে ধরা পড়েছিল

মাইক টাইসন এমন হাবভাব করছিলেন, যেন হেভিওয়েট বক্সিংয়ে তিনিই 'গ্রেটেস্ট'। কিন্তু অখ্যাত অজ্ঞাত ডগলাস তাঁকে নক আউট করে তাঁর সব অহঙ্কার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। আসলে টাইসন হয়তো এতদিন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হননি। তাঁর বক্সিংয়ে দুর্বলতাগুলি কিন্তু অনেকদিন আগেই মহম্মদ আলির চোখে পড়েছিল। কিছুদিন আগে ভারতে এসেছিলেন মহম্মদ আলি। প্রাক্তন বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, ইদানীং তিনি আর তেমন বক্সিং দেখেন না। তবে যেটুকু দেখেছেন তাতে মাইক টাইসনই তাঁর নজর

কেড়েছেন। কিন্তু হলে হবে কী! আলি বলেছিলেন, "টাইসনের গায়ে খুব জোর আছে। তবে খুব মন্থর গতিতে সে নড়াচড়া করে। ওর মতো বয়সে আমি আরও চটপট নড়াচড়া করতাম, ঘুসিও মারতাম তড়িঘড়ি।" এই মন্থরতাই কি টাইসনের কাল হল?

নতুন ভূমিকা নিতে চলেছেন বেকেনবাওয়ার

আসন্ন বিশ্বকাপ ফুটবলের পর পশ্চিম জার্মানি দলের ম্যানেজার ফ্রাঙ্ক বেকেনবাওয়ার নতুন কেরিয়ার শুরু করবেন। তিনি আর দলের ম্যানেজার থাকবেন না। ম্যানেজার হবেন তাঁর সহকারী বার্তি ভোট্স। বেকেনবাওয়ার ও ভোট্স পশ্চিম জার্মানি দলের হয়ে একসঙ্গে খেলেছেন। ম্যানেজার হিসেবে ছ' বছর পশ্চিম জার্মানি দলের দায়িত্বে থাকার পর

বেকেনবাওয়ার এক স্পোর্টস এজেন্সির সিনিয়ার এক্সিকিউটিভ হতে চলেছেন। বিশ্ব ফুটবলের প্রধান সংস্থা ফিফা-র সঙ্গে এই এজেন্সি বিশেষভাবে যুক্ত। সুতরাং ফুটবলের সঙ্গে বেকেনবাওয়ারের সম্পর্ক ছিন্ন হচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে, ১৯৯৪-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ ফুটবলে তাঁকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে। সত্তরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবলের প্রসারেও তাঁর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল।

মার্শালের ইচ্ছে

এবারের ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট-সিরিজ শুরুর আগে পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার ম্যালকম মার্শাল-এর সংগ্রহ ৩২৬টি উইকেট। মার্শালের লক্ষ্য কি ৪০০ উইকেট? মার্শাল কিন্তু অন্য কথা জানিয়েছেন। বলেছেন, "প্রথমে ৩৫০ উইকেট পাই, তারপর ৪০০ উইকেটের জন্য চেষ্টা করব। ৪০০ উইকেট অনেক দূরের ব্যাপার। শরীরটাকে সুস্থ রাখার ওপরেও অনেক কিছু নির্ভর করছে।" ৩১ বছর বয়সী মার্শাল আরও বলেছেন, "৩০ বছর বয়সের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক'জন পেসারই বা টেস্ট খেলেছেন!" তা হলে মার্শালের জীবনের কি কোনও লক্ষ্য নেই? নেই কোনও ইচ্ছে? আছে। মার্শাল জানিয়েছেন, "আমার একটাই স্বপ্ন। টেস্টে সেঞ্চুরি করা। নৈশপ্রহরী হিসেবে কিংবা বিশেষজ্ঞ কোনও ব্যাটসম্যান আহত হলে আমি ইনিংসের গোড়ার দিকে ব্যাট করতে পারি। তখন একটা সেঞ্চুরির চেষ্টা করা যাবে।" ১৯৮৩-তে কানপুরে ভারতের বিরুদ্ধে ৯২ রানই টেস্টে মার্শালের সর্বোচ্চ রান। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অবশ্য মার্শালের চারটি সেঞ্চুরি আছে।

জাহাঙ্গির ক্রিকেট খেললেন

ওমানের মাস্কট-এ সম্প্রতি দুই ভাইকে ক্রিকেট-যুদ্ধে নামতে দেখা গিয়েছিল। এঁরা হলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বিশ্ববিখ্যাত ব্যাটসম্যান জহির আব্বাস এবং তাঁর ভাই তফসির। জহির আব্বাসের পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স (পি আই এ) মাস্কটে তফসিরের দলের কাছে হেরে যায়। তফসির কাজ করেন মাস্কটের একটি ব্যাঙ্কে। ৪৫ ওভারে পি আই এ দলের ৭ উইকেটে ২৬৫ রানে তফসির নিয়েছেন চারটি উইকেট। তিনি রান দিয়েছিলেন ৪৬। মাত্র এক উইকেট হারিয়ে তফসিরের দল প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। খেলার তখনও দু' ওভার বাকি ছিল। তফসিরের দলে নামকরা কোনও ক্রিকেটার ছিলেন না। তবে, তাঁর দলের সাজ্জাদ আমেদ ১২২ রানে অপরাজিত থেকে 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' পুরস্কারটি পান। সবচেয়ে বড় খবর, স্কোয়াশ-সম্রাট জাহাঙ্গির

খান সেদিন পি আই এ দলের হয়ে খেলেছিলেন। তিনি ১৩ রান করেন। দু' ওভার বল করে ২১ রান দেন। সেদিন অধিকাংশ সময় জাহাঙ্গিরকে বাউন্ডারি-লাইনে ফিল্ডিং করতে দেখা গিয়েছিল। স্কোয়াশের পরাক্রমশালী সম্রাট জাহাঙ্গিরের নামডাক সারা পৃথিবীতে। বিশ্বজোড়া এরকম খ্যাতি পাকিস্তানের আর কোনও খেলোয়াড়েরই নেই। পাকিস্তান সরকার তাঁকে নিয়ে আগেই ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন।

বন্ধ হল আল্ফ গোভারের স্কুল

আল্ফ গোভারের বিশ্ববিখ্যাত ইনডোর ক্রিকেট স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেল। কলিন কাউড্রে, টম গ্রেভ্নি, হানিফ মহম্মদ, ভিভ রিচার্ডস, অ্যান্ডি রবার্টস, ফ্রেড টিটমাস ও ফ্র্যাঙ্ক টাইসনের মতো ক্রিকেটাররা এই স্কুলে তালিম নিয়েছেন। আল্ফ গোভারের প্রশিক্ষণে তাঁরা যে কী লাভবান হয়েছেন তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীর ক্রিকেট-মাঠে। স্কুলটি ইংল্যান্ডে। সেখানে এখন একটি বিনোদন-কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। গোভারের বয়স এখন ৮১। দীর্ঘ ৫১ বছর তিনি এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৩ সালে এর মালিকানা-স্বত্ব পান। ইংল্যান্ডের হয়ে চারটি টেস্ট খেলেছেন গোভার। ১২ বছর তিনি ক্রিকেট নিয়ে সাংবাদিকতাও করছেন।

মোরের প্রিয় বই

ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষক কিরণ মোরে সময় পেলেই ক্রিকেটারদের লেখা বই পড়েন। বিশেষ করে, ক্রিকেটারদের আত্মজীবনী। মোরে জানিয়েছেন, "আমার প্রিয় বই গর্ডন গ্রিনিজ-এর 'ম্যান ইন দ্য মিড্‌ল'।" গ্রিনিজের ছেলেবেলা কেটেছে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টে। এমনকী, ইংল্যান্ডে গিয়েও তাঁকে দারিদ্র্য ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন লড়াই করতে হয়েছিল।

মাঝমাঠের লড়াই

পূর্ব প্রকাশিতের পর

প্রসূন ব্যানার্জি সম্বন্ধে আমার আরও কিছু বলার আছে। প্রকৃতপক্ষে গোপালকে আমি যত দেখেছি ততই মুগ্ধ হয়েছি। সিনিয়ার ফুটবলার হিসেবে 'মুভমেণ্ট' তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা নিত প্রসূনই। অনেকে বলে, প্রসূন নাকি বাঁ পায়ের প্লেয়ার, অর্থাৎ 'ইনকমপ্লিট ফুটবলার'। আমি মানি না। প্রথমত, ওর দুটো পা-ই ভাল চলত। আর বাঁ পায়ে যে-খেলাটা ও খেলত তা অন্যের দু' পায়ের সমান। এবং সমান দাপটে ও যদি না খেলতে পারত, তা হলে কলকাতা মাঠে এতদিন কর্তৃত্ব করতে পারত না। যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁরা কেন যে এ কথাগুলো ভাবেন না কে জানে!

গোপালের দারুণ একটা ব্যাপার ছিল। ও ফোর্স করে বিপক্ষের খেলোয়াড়কে আটকাত। অর্থাৎ, এমন ভাব দেখাত যেন বাঁ দিকটা খালি। ওখান দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড় বল নিয়ে বেরনোর চেষ্টা করতে গিয়ে ওর কাছে আটকে যেত। এসব একেবারে ওর নিজস্ব ধরন। কারও কাছে শেখেনি।

অনেকদিন একসঙ্গে খেলার ফলে আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। প্রসূন দূরপাল্লার থ্রু-পাসও বাড়াতে পারত খুব সুন্দর, একেবারে সঠিক লক্ষ্যে, পিন্টুর মতো। খেলা ছড়িয়ে দিতে ওর জুড়ি ছিল না। বাঁ দিকটা আটকে গেলে ডান দিকে বল বাড়িয়ে আক্রমণ গড়ে তুলত। মানস, বিদেশ নিঃসন্দেহে ভাল খেলোয়াড়। কিন্তু প্রসূনের বাড়ানো বলে ওরা কতবার যে জালে বল রাখতে পেরেছে তার ইয়ত্তা নেই।

আমার সঙ্গে মাঠে গোপালের বোঝাপড়াটা ছিল খুব ভাল। মাঝে-মাঝে বল নিয়ে আমরা মজা করতাম। একটা অ্যাটাক বা ডিফেন্সের পর দলের সবাই যখন ক্লান্ত, আমরা দু'জনে খেলাটাকে 'স্লো' করে দিয়ে নিজেদের মধ্যে টানা আট দশটা পাস খেলতাম। কোনও খেলোয়াড় বা দলকে ছোট করছি না, কিন্তু এটা আমরা করতে পারতাম। তবে অবশ্যই বড় দলের সঙ্গে এটা হত না, ছোটখাটো দলের বিপক্ষেই করতাম। ফ্রি কিক মারাতেও মজা করতাম। কখনও ও বল বসিয়ে মারার ভান করত, আমি মারতাম। কখনও বা উলটোটা হত। ওর ফ্রি কিকে ভাল কাজ ছিল। বিপক্ষ বুঝতেই পারত না। প্রসূনের আর-একটা কাজের কথা বলতে ভুলে গেছি।

ফুটবলের জাদুকর মহম্মদ হাবিব
ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

ওর 'অন দি মুভ ড্রিব্‌ল' ছিল দেখবার মতো। বাঁ পায়ের ইনসাইড বা আউটসাইড ডজে ছিল চোখ-জুড়নো 'টাচ'।

খেলার মাঠের 'কাজ'-এর কথা বললাম, এবার গোপালের মাঠের বাইরের 'কাজ'-এর কথা কিছু বলি। ও খুব সুন্দর হিন্দি বলতে পারে। ছেলেবেলা জামশেদপুরে কেটেছে বলেই হয়তো। একবার দিল্লিতে ওর এই হিন্দি বলায় কী মজাটাই না হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে দিল্লির স্টেডিয়ামে আমরা আছি, ভারতের হয়ে বাইরে খেলতে যাব।

দিল্লিতে ইস্টবেঙ্গলের লোকাল ম্যানেজার মামিক আমাকে একদিন ওর দরিয়াগঞ্জের বাড়িতে ডিনারের নেমন্তন্ন করল। প্রসূনকে বললাম, "চল,আমার সঙ্গে।" বেরিয়েছি, আমার গায়ে ছিল মিলিটারিদের মতো দেখতে একটা জ্যাকেট। ট্যাক্সি-ড্রাইভার কিছুতেই যেতে চায় না অত দূর। প্রসূন বলল, "দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি। আমি যা বলব তুই শুধু শুনে যাবি। জেঠু (প্রসূন আমাকে ওই নামেই ডাকে, কেন, এখনও অবশ্য জানি না!) একদম কথা বলবি না, হাসবিও না।" তারপরই ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলল, "কিঁউ ভাই, নাহি জায়েগা ? এ সাব মিলিটারি ক্যাপ্টেন হ্যায়। না গেলে তোমাকে ধরে জেলে পুরে দেবে।" ক্যাপ্টেন শুনেই ড্রাইভারজির মেজাজটাই গেল বদলে। বলল, "চলুন সাব।" তারপর শুরু হল আর-এক কাণ্ড। যেতে-যেতে আমাকে বলতে লাগল, "সাব, আমার এক ভাই আছে। বেকার। আপনার তো অনেক ক্ষমতা, যদি একটা চাকরি করে দেন।" আমি উত্তর দেব কী, গোপালের দিকে শুধু তাকাতে লাগলাম। ওর নির্দেশ অমান্য করি কী করে! প্রসূন গম্ভীরভাবে বলল, "হো যায়গা।" দরিয়াগঞ্জে পৌঁছলাম। ড্রাইভারজি তো কিছুতেই ভাড়া নেবে না। অনেক বুঝিয়ে ভাড়া দিলাম। মামিকের বাড়ি পৌঁছে আমাদের সে কী হাসি। গোপালের অভিনয় একেবারে পাকা অভিনেতার মতো। ড্রাইভারজির ভাইয়ের জন্য কষ্টও যে হচ্ছিল

গৌতম সরকার

না তা নয়, চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। আমরা খেলে লোকেদের আনন্দ দিতে পারি, এর বেশি আর কিছুই করতে পারি না।

অবশ্য এই মতবাদ যিনি একেবারেই বিশ্বাস করেন না এবং কথাটা শুনলে এখনও ভীষণ চটে যাবেন, তাঁর সঙ্গেও আমি খেলেছি। খেলেছি না বলে, বলা উচিত আমার খেলার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর কাছে খেলা হচ্ছে জীবন-মরণ লড়াই, মন-প্রাণ ঢেলে দেওয়া একটা কাজ। উচ্ছ্বাসের কোনও ব্যাপারই নেই।

যারা বোঝার, তারা কিন্তু ঠিকই বুঝে নিয়েছে। ময়দানে গত কুড়ি বছরে এরকম মন-প্রাণ সঁপে দেওয়া আর কোনও ফুটবলার এসেছে হাবিব মিঞা ছাড়া? আমি ওঁকে বলতাম, হাবিবভাই। বলা উচিত ছিল হাবিব গুরু। গুরু নয়তো কী? ফুটবলার হওয়ার জন্য কোচের সাহায্য দরকার, কিন্তু নিজের খেলা ধরে রাখার জন্য, মাথা উঁচু করে ময়দানে ঘুরে বেড়ানোর জন্য যাঁকে আদর্শ করা উচিত, তাঁর নাম হাবিব। এই সেদিন, কোচিং ক্যাম্পে এক জুনিয়ার ফুটবলারকে বললাম, "তোরা দেখতে পেলি না ফুটবলার হয়ে বেঁচে থাকার জন্য হাবিব কী ত্যাগস্বীকারই না করেছেন।" ওঁর ত্যাগ, ওঁর সংযম দেখে সত্যিই আমরা ওঁকে গুরু বলে মনে করতাম। কোনও নেশাই করেননি কখনও। শরীরের ক্ষতি হতে পারে, তাই রাত দশটার পর ঘুমোতে চলে যেতেন। তখন পৃথিবী একদিকে এবং হাবিবভাই আর-একদিকে। এবং এর নড়চড় হত না একদিনও। ১৯৭৩-এ বরদলুই জিতলাম আমরা। খেলার কয়েকটা দিন আমরা, ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা, খুব নিয়ম পালন করেছিলাম। কিন্তু জেতার পর মনে হল—এবার একটু আনন্দ করা যেতে পারে। রাত্রিবেলা হোটেলে তাই আমরা বেশ রাত পর্যন্ত হইচই করলাম। সেই আসরে একজনই গরহাজির ছিলেন, তাঁর নাম হাবিব। আনন্দটা হাবিবের কাছে কোনও ব্যাপার নয়, একমাত্র ব্যাপার খেলা। খেলা, জয় এবং আবার খেলা, আবার জয়। গোলের পর হাবিবকে আনন্দে আত্মহারা হতে দেখিনি। যেন গোল দেওয়াটাই কাজ, তা নিয়ে মাতামাতিটা খেলোয়াড়ের কাজ নয়। এরকম মানসিকতা ক'জন খেলোয়াড়ের আছে?

হাবিব জয়ে উচ্ছ্বসিত না হলেও পরাজয়ে কিন্তু দারুণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন। কিছুতেই পরাজয়কে মেনে নিতে পারতেন না। পরাজয়কে ঘৃণাই করতেন। হয়তো আমরা এক গোলে পিছিয়ে, কিছুতেই গোল শোধ হচ্ছে না, হাবিব একেবারে আক্ষরিক অর্থে খেপে যেতেন। আমার কাছে ছুটে আসতেন, বলতেন, "গৌতম, আজ হামকো দেখানা হ্যায়, হাম ভি খেল জানতা।" বলতেন, "তুই আমাকে ঠিকঠাক বল দে, দ্যাখ, গোল শোধ করবই।" তারপর সত্যিই হাবিব যেসব গোল করতেন বা গোলের জন্য চেষ্টা চালাতেন, তা দেখবার মতো।

১৯৭২-এ ইস্টবেঙ্গলে আমি একেবারে নতুন, বরদলুই খেলতে গিয়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ি। বিছানায় শুয়ে দিন কাটাতে হচ্ছিল। বিদেশ-বিভুঁই। আমাকে দেখার জন্য আলাদা কোনও লোক ছিল না। তাই নিয়মমতো ওষুধ জুটছিল না। একদিন এ-কথা জানতে পেরে সকাল-বিকেল দু' বেলা নিয়ম করে হাবিবভাই আমাকে ওষুধ খাইয়ে যেতে লাগলেন। ভাবা যায়! হাবিব তখন রীতিমত স্টার! কিন্তু আমার কাছে ওঁর ভূমিকা তখন দাদার মতো। এরকম অভিভাবকের ভূমিকা হাবিব সব সময়ই নিয়েছেন। তাই আবার বলছি, এখনকার তরুণরা সত্যিই একজন আদর্শ ফুটবলারের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমার সত্যিই ওদের জন্য দুঃখ হয়। কারণ হাবিবের সাহায্য, ভালবাসা এবং প্রেরণা যে একজন খেলোয়াড়কে কতটা বদলে দিতে পারে, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমি।

সহ-খেলোয়াড়দের নীরবে সাহায্য করে গেছে আর-একজনও। শিবাজি ব্যানার্জির কথাই আমি বলছি। 'টিমম্যান' বলতে যা বোঝায় শিবাজি ঠিক তাই। গোলে দাঁড়িয়ে পুরো দলটাকে সে উদ্বুদ্ধ করত। গোলরক্ষক হিসেবে ওর কৃতিত্বও একেবারে কম নয়। শুধু পেনাল্টি কিক বাঁচিয়ে ও একসময় মোহনবাগান দলকে ১৪-১৫টা ট্রোফি এনে দিয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও ওর বড় ভূমিকা মাঠের বাইরে আমি দেখেছি। আনন্দে, দুঃখে দলের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যেত শিবাজি। বাইরে খেলতে গিয়ে কোনও খেলোয়াড়ের মন খারাপ, তাকে সঙ্গ দেবে কে? না, শিবাজি। শরীর খারাপ হয়েছে কারও, তার পাশে থাকবে কে? শিবাজি। এসব ওর কাজ নয়। কিন্তু শিবাজি মন থেকেই এগুলো করে গেছে। দলের সঙ্গে একাত্ম বোধ করতে ভালবাসত সে। আর সেই শিবাজি কী পেয়েছে? দল হারলেই তাকে বলির পাঁঠা করা হয়েছে। প্রাপ্য সম্মান থেকে করা হয়েছে বঞ্চিত। মোহনবাগান দলের অধিনায়কত্ব ওকে দেওয়া হয়নি। (ক্রমশ)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

ফোটো: তপন দাস

শিবাজির মতো 'টিমম্যান' খুব কমই দেখা যায়। গোলে দাঁড়িয়ে পুরো দলটাকে সে উদ্বুদ্ধ করত। গোলরক্ষক হিসেবে ওর কৃতিত্বও একেবারে কম নয়। শুধু পেনাল্টি কিক বাঁচিয়ে ও এক সময় মোহনবাগান দলকে ১৪-১৫টা ট্রোফি এনে দিয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও ওর বড় ভূমিকা মাঠের বাইরে আমি দেখেছি। আনন্দে, দুঃখে দলের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যেত শিবাজি।

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

সুতো ইওকো উচি

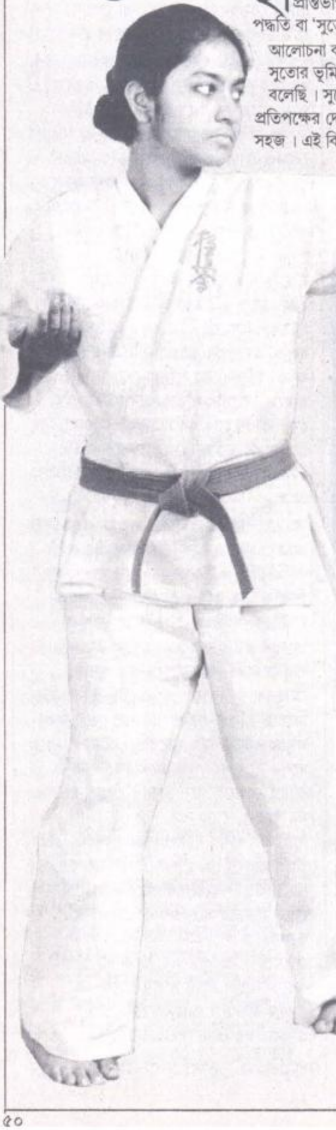

হাতের তালুর বাইরের প্রান্তভাগ দিয়ে আঘাত করার পদ্ধতি বা 'সুতো' নিয়ে এবারও আলোচনা করব। ক্যারাটেতে সুতোর ভূমিকার কথা আগেই বলেছি। সুতোর ব্যবহার প্রতিপক্ষের দেহের কয়েকটি অংশে সহজ। এই বিষয়টি ভালভাবে না জানা থাকলে সুতোর ব্যবহার কঠিন। তবে সুতো ব্যবহারের একটি বিশেষ সুবিধে আছে, তা হল—সুতো-য় হাতের চেটোর বাইরের মাংসল প্রান্তভাগ দিয়ে আঘাত করা হয় বলে প্রতিপক্ষের দেহের কোনও অংশ সহজে ফেটে বা কেটে যায় না। নিজেরও খুব বেশি ব্যথা লাগে না, কিন্তু 'সুকি'র

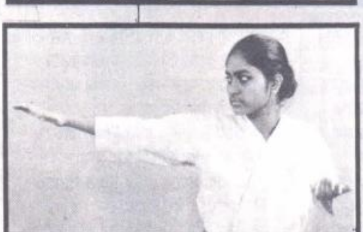

ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের দেহের কোনও শক্ত অংশে আঘাত করলে হাতের আঙুলের প্রথম সন্ধিস্থলে বেশ ব্যথা লাগে এবং প্রতিপক্ষের শরীরের যেখানে আঘাত করা হল, সেখানে ফেটে বা কেটে যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। তবে এটাও ঠিক যে, অবস্থা অনুযায়ী প্রতিপক্ষের দেহের কয়েকটি অংশে সুকি এবং কয়েকটি অংশে সুতোর ব্যবহারই ঠিক। এখন আমি যে সুতো নিয়ে আলোচনা করব তার জাপানি নাম 'সুতো ইওকো উচি'।

সুতো ইওকো উচি : সুতো কথার অর্থ আগেই বলেছি, ইওকো কথার অর্থ পাশে, উচি কথার অর্থ আঘাত। আগেই বলেছি যে, কিওকুশিন ক্যারাটের হাতের কৌশল অনুশীলন করার সময় সানচিনদাচি থেকে করা হয়। সেইমতো প্রথমে ইওইদাচিতে দাঁড়াতে হবে, তারপর হাত ও পায়ের অবস্থার পরিবর্তন করে ঠিকভাবে সানচিনদাচিতে দাঁড়াতে হবে। সেইসঙ্গে সুতো ইওকো উচি অনুশীলনের জন্য ডান হাতটা ডান পাঁজরের সঙ্গে স্পর্শ করে রেখে বাঁ হাতটা বাঁ দিকে কনুই থেকে একটু মুড়ে ছড়িয়ে দাঁড়াতে হবে। এবার বাঁ দিকে তাকাতে হবে। বাঁ হাতটা নিজের গলার উচ্চতার সমান করে বাঁ হাতের চেটো নীচের দিকে থাকবে এবং ডান হাতের চেটো ওপর দিকে থাকবে। এর পর ডান হাতটা দিয়ে শুরু হবে। ডান হাতটা বাঁ কাঁধের কাছে স্পর্শ করে হাতের চেটো যতটা ঘুরিয়ে ওপর করে রাখা যায়, রাখতে হবে। বাঁ হাতটা সরে এসে ডান হাতের নীচে দিয়ে ডান পাঁজর স্পর্শ করে রাখতে হবে। বাঁ হাতের চেটো নীচের দিকে থাকবে। এবার ডান হাতটা ঠিকভাবে ডান দিকে ছুঁড়তে হবে। লক্ষ রাখতে হবে, কনুই থেকে যেন ডান হাতটা একটু মুড়ে হাতের চেটো মাটির দিকে (নীচে) আঘাত করতে হবে, সেইসঙ্গে বাঁ হাতটা সরে এসে বাঁ পাঁজর স্পর্শ করে থাকবে। এবার আবার বাঁ হাত দিয়ে তারপর ডান হাত দিয়ে অনুশীলন করতে হবে, প্রতি হাতে কুড়িবার করে। শরীরের ওপর ভাগ এই পদ্ধতি অনুশীলনের সময় সোজা থাকবে। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, যেন কাঁধের কাছে বা কনুইতে কোনওরকম ঝটকা না লাগে। প্রথমে আস্তে-আস্তে, তারপর অভ্যাস হলে 'স্পিড' বাড়াতে হবে।

ফোটো : উৎপল সরকার

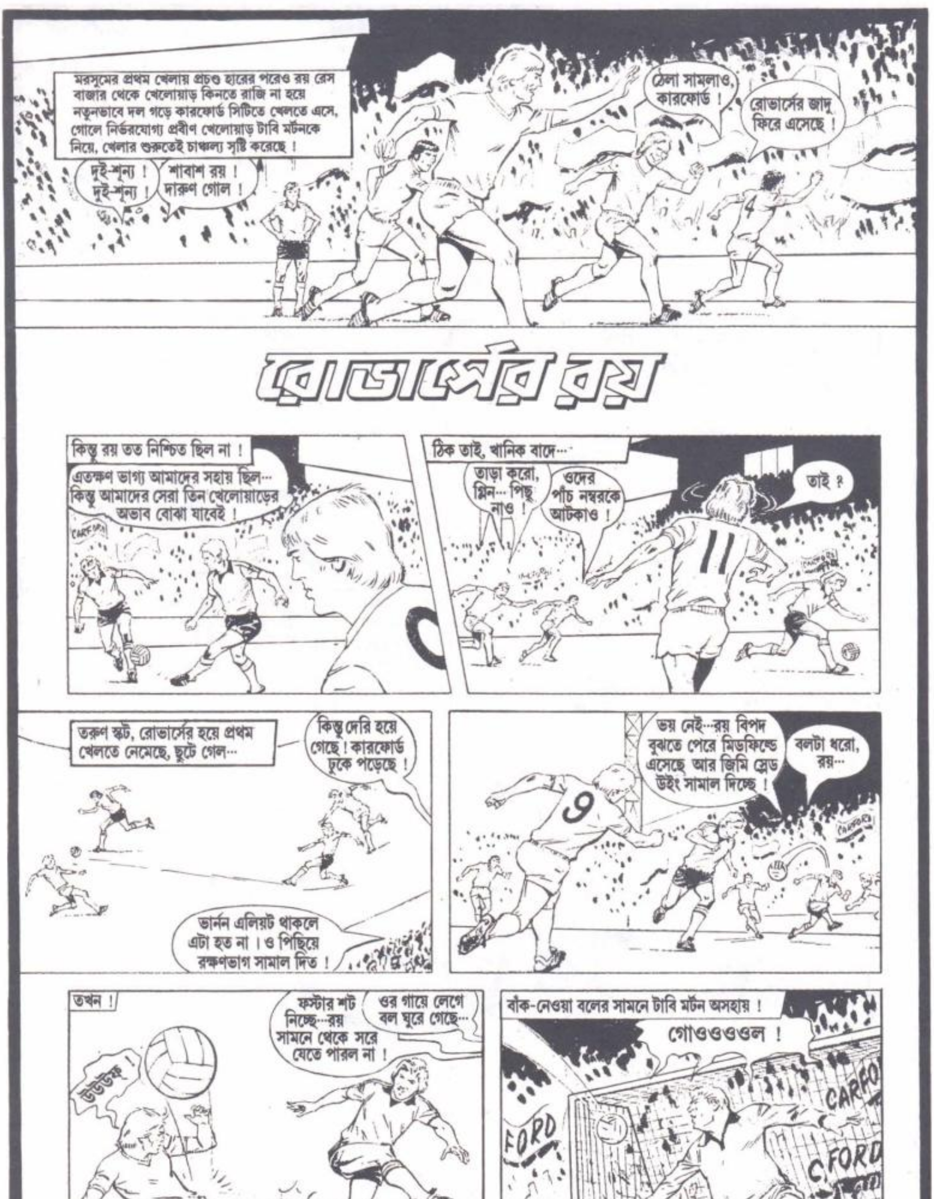
মরসুমের প্রথম খেলায় প্রচণ্ড হারের পরেও রয় রেস বাজার থেকে খেলোয়াড় কিনতে রাজি না হয়ে নতুনভাবে দল গড়ে কারফোর্ড সিটিতে খেলতে এসে, গোলে নির্ভরযোগ্য প্রবীণ খেলোয়াড় টাবি মর্টনকে নিয়ে, খেলার শুরুতেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে !
দুই-শূন্য ! দুই-শূন্য !
শাবাশ রয় ! দারুণ গোল !
ঠেলা সামলাও, কারফোর্ড !
রোভার্সের জাদু ফিরে এসেছে !
রোভার্সের রয়
কিন্তু রয় তত নিশ্চিত ছিল না !
এতক্ষণ ভাগ্য আমাদের সহায় ছিল··· কিন্তু আমাদের সেরা তিন খেলোয়াড়ের অভাব বোঝা যাবেই !
ঠিক তাই, খানিক বাদে···
তাড়া করো, গ্লিন··· পিছু নাও !
ওদের পাঁচ নম্বরকে আটকাও !
তাই ?
তরুণ স্কট, রোভার্সের হয়ে প্রথম খেলতে নেমেছে, ছুটে গেল···
কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ! কারফোর্ড ঢুকে পড়েছে !
ভার্নন এলিয়ট থাকলে এটা হত না । ও পিছিয়ে রক্ষণভাগ সামাল দিত !
ভয় নেই···রয় বিপদ বুঝতে পেরে মিডফিল্ডে এসেছে আর জিমি স্লেড উইং সামাল দিচ্ছে !
বলটা ধরো, রয়···
তখন !
ফস্টার শট নিচ্ছে···রয় সামনে থেকে সরে যেতে পারল না !
ওর গায়ে লেগে বল ঘুরে গেছে···
উউউফ !
বাঁক-নেওয়া বলের সামনে টাবি মর্টন অসহায় !
গোওওওওল !
CARFORD

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

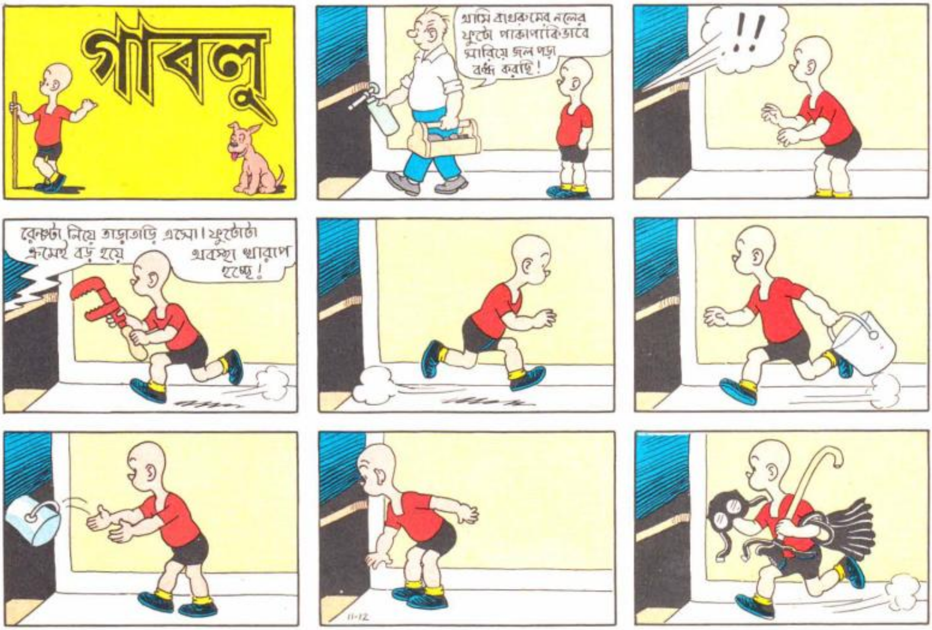
গাবলু
আমি বাথরুমের নলের ফুটো পাকাপাকিভাবে সারিয়ে জল পড়া বন্ধ করছি!
!!
রেঞ্চটা নিয়ে তাড়াতাড়ি এসো। ফুটোটা ক্রমেই বড় হয়ে অবস্থা খারাপ হচ্ছে!
11-12

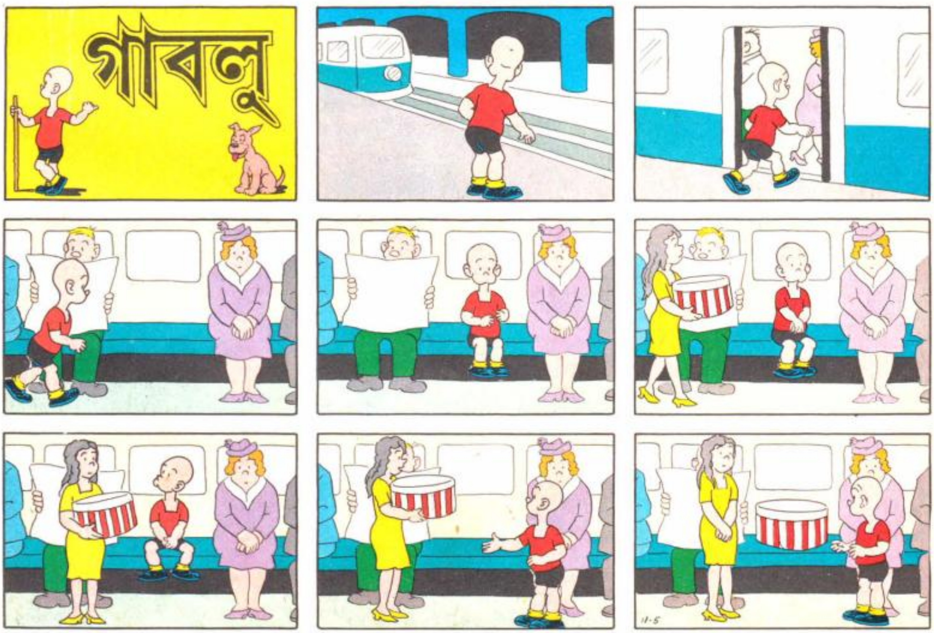
গাবলু
11-5

কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচি

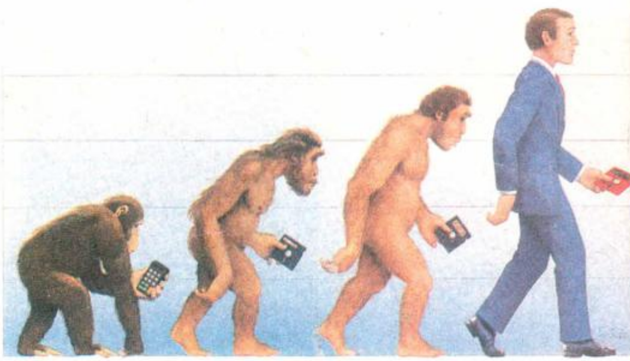

১৯৭০ হাতে-ধরা ক্যালকুলেটর | ১৯৭৯ ভিশিক্যাল্‌ক | ১৯৮২ বিখ্যাত লোটাস ১-২-৩ | ১৯৮৭ কোয়ার্টো

সফটওয়্যারের ক্রমোন্নতি : ক্যালকুলেটর

বিশ্বের নানা দেশের মতো ভারতও নিয়েছে কম্পিউটার-সাক্ষরতার কর্মসূচি । জানিয়েছেন

অসীমরতন ঘোষ

গ্রাফিক্‌স প্রোগ্রাম দিয়ে তৈরি ছবি

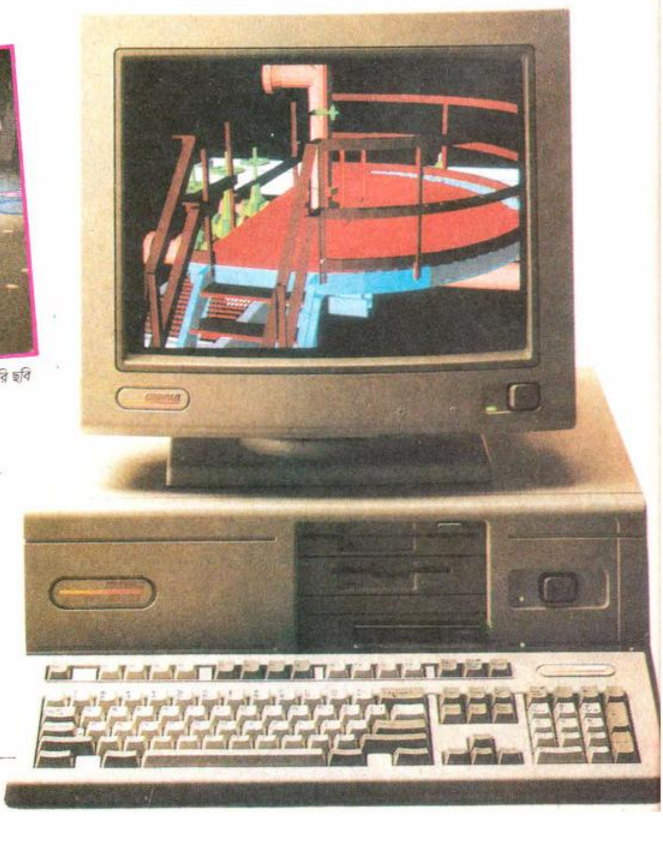

এক মিনিটের জন্য চোখ বন্ধ করে তোমার হাত দুটো 'আনন্দমেলা'র পাতার ওপরে রাখো । আচ্ছা, এবার চিন্তা করো তো ঠিক কী কী কাজ করলে, আর কীভাবেই বা তা করলে । হ্যাঁ, তোমার চোখ বন্ধ করে ফেলা আর হাত দুটো বইয়ের পাতার ওপর রাখার নির্দেশ জানিয়ে দিল মস্তিষ্কে । সেখান থেকে পালটা নির্দেশ এল চোখ আর হাতে । কিন্তু কাজটা করার জন্য তোমাকে এক মুহূর্তও চিন্তা করতে হয়নি বা এত কিছু ভাবতেও হয়নি । কিন্তু আজকের দিনের সবচেয়ে শক্তিমান কম্পিউটারের বুদ্ধি একটা শিশুর চেয়েও কম । নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কোনও কাজই সে করতে পারে না ।

তাই ওকে দিয়ে কোনও কাজ করাতে চাইলে তোমাকে কাজটি করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি ধাপ বলে দিতে হবে । একেই বলে কম্পিউটার প্রোগ্রাম । আরও একটা মুশকিল হল, মানুষের ভাষাও সে বুঝতে পারে না । সুইচ অফ আর অন, মানে আমরা যাদের বলি '০' আর '১'— এই ছাড়া কম্পিউটার আর কিছুই বোঝে না । তাই কম্পিউটারকে নির্দেশ দিতে গেলে ০ আর ১ দিয়ে তৈরি মালা বা সুইচ খোলা-বন্ধের বিবিধ বিন্যাসের মাধ্যমেই তা করতে হয় । খোলা-বন্ধের কাজটা অবশ্য হাত দিয়ে করতে হয় না । মানুষ ০ ও ১-এর বিন্যাস ব্যবহার করে যন্ত্রের ভাষায় কম্পিউটার-প্রোগ্রাম লিখতে পারে । প্রথমদিকে তাই-ই করা হত । যন্ত্রের ভাষা নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে । সহজে আর তাড়াতাড়ি প্রোগ্রাম করতে তৈরি হল অ্যাসেমব্লি ভাষা । যন্ত্রের ভাষার কাছাকাছি বলে এদের নীচের সারির ভাষা বলা হয় । শূন্য আর এক-এর মালার বদলে দু-তিনটি অক্ষরে তৈরি নির্দেশ ব্যবহার করা হল এর ফলে । আসলে করা হল কী, অ্যাসেমব্লার নামে আর-একটি প্রোগ্রাম দিয়ে ওই ভাষাকে যন্ত্রের ভাষায় অনুবাদ করে ফেলা হল । কম্পিউটারের ভাষাকে আরও শক্তিশালী, ছোট আর সহজ করার জন্য চেষ্টা চলতে লাগল । ফল— ওপরের সারির সাংকেতিক ভাষা বা হাই লেভেল সিম্বলিক ল্যাঙ্গুয়েজ । কম্পাইলার নামের প্রোগ্রাম, এদের যন্ত্রের ভাষায় অনুবাদ করে দেয় । সোজা কথায় তোমার আর যন্ত্রের ভাষা পুরোপুরি আলাদা । তুমি একটু চেষ্টা করলেই শিখে নিতে পারো, এমন ভাষা তৈরি করা হয়েছে । বোকা কম্পিউটার কিন্তু তাও পারে না । তাই সে নীচের সারির ভাষা বুঝতে অ্যাসেমব্লার আর ওপরের সারির ভাষা বুঝতে কম্পাইলার নামে দোভাষী নিয়ে তোমার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করে কিংবা হুকুম তামিল করে । একটা ব্যাপার কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কম্পিউটারের দানবীয় শরীরটা একা একা বিশেষ কিছুই করতে পারে না । অনেক সময়ই দেখা যায় কম্পিউটারকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে একদল প্রোগ্রাম । ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে এরা কাজ করে যায় । সাধারণভাবে এইসব প্রোগ্রামকে সফটওয়্যার বলে । কোনও হিসেব, পরিসংখ্যানের কাজ বা ছবি আঁকার জন্য তুমি যে সফটওয়্যার ব্যবহার করবে তার নাম ব্যবহারিক সফটওয়্যার । কম্পিউটার সিস্টেমকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার ভার নেয় সিস্টেম সফটওয়্যার) । এদের একদল হল কম্পিউটারের ভাষা । সিস্টেম ইউটিলিটি একদিকে তোমাকে প্রোগ্রাম লেখা থেকে শুরু করে, ভুল সংশোধন, মূল স্মৃতিতে প্রোগ্রাম পাঠাতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে সে কম্পিউটারের সময় ও স্বাস্থ্যের দিকে কড়া নজর রাখবে । সাধারণভাবে সফটওয়্যার ও প্রোগ্রাম কথা দুটো একে অন্যের বদলে ব্যবহৃত হতে পারে ।

কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে তা খুব ছোট করে বলা হল । এ নিয়ে আরও অনেক কথাই পরে বলা হবে । তার আগে কয়েকটা ব্যাপারে চোখ ফেলা যাক । কেন তুমি কম্পিউটার সম্পর্কে জানবে ?

(১) আমাদের সময়ের দাম বেড়েই চলেছে । কম্পিউটার সময়ের দারুণ সাশ্রয় করে । মানুষের কয়েক মাস বা বছরের কাজ সম্পন্ন হয় কয়েক মিনিটে ।

(২) মানুষের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য কম্পিউটার ।

(৩) পৃথিবীর সমস্ত কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার হচ্ছে ।

(৪) কম্পিউটার মানব সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে অসম্ভব দ্রুততা এনেছে ।

(৫) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচার করলে

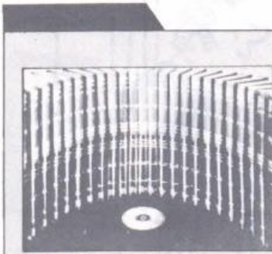

ছোট্ট একটা অপটিকাল ডিস্ক

কুড়ি-পঁচিশ খণ্ডের বিশ্বকোষ এখন কম্পিউটারের দৌলতে বহনযোগ্য হয়ে উঠেছে । ছোট্ট একটি পড়ার অপটিকাল ডিস্কেই ধরে যায় হাজার-হাজার তথ্য । এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে সুইচ টিপেই পৃথিবীর যে-কোনও বিষয় সম্পর্কে জেনে নেওয়া যায় ।

ফ্লপি ডিস্কে রাখা প্রোগ্রাম ও তথ্য পাঠানো হচ্ছে কম্পিউটারে

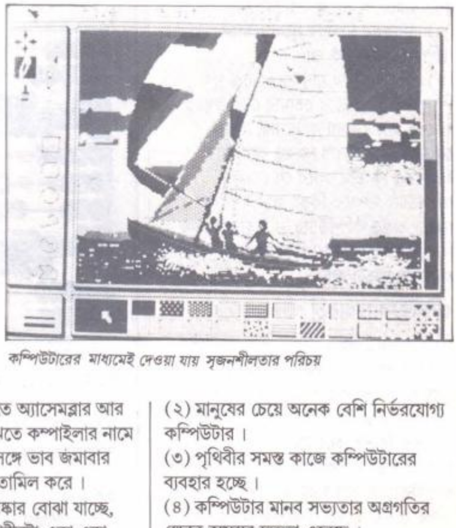

কম্পিউটারের মাধ্যমেই দেওয়া যায় সৃজনশীলতার পরিচয়

রোবটের মতো কম্পিউটার

মানুষের মতো দেখতে আগাগোড়া ধাতু দিয়ে তৈরি যন্ত্র, রোবটের নানারকম কাজকর্ম আমরা দেখতে পাই সিনেমা বা টেলিভিশনের পরদায় । আসল রোবট কিন্তু একেবারেই এরকম দেখতে নয় । কল্পবিজ্ঞানের চলচ্চিত্রের দৌলতে মানুষের মতো দেখতে রোবটের ছবিটি আমাদের মনে গেঁথে গেছে । তবে আশার কথা, এই দশকেই মানুষের মতো দেখতে রোবট বাজারে এসে যাবে । বাড়ির বিভিন্ন কাজ করে দেবে এরা । গৃহপালিত রোবটগুলোকে ঠিকমতো প্রোগ্রাম করে তোমার প্রয়োজনীয় কাজগুলো করিয়ে নিতে পারবে ।

কিছুতেই আমরা পিছিয়ে পড়ার নীতিতে বিশ্বাস করতে পারি না ।
(৬) শতাব্দীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই আবিষ্কারকে অস্বীকার করা যায় না ।
(৭) নানারকম চাকরির সুযোগ আনে কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান ।
(৮) দেশ-বিদেশের মানুষদের মতো খুব শিগগিরই কম্পিউটার তোমার সেরা বন্ধুতে পরিণত হবে । সময় কাটানোর, শিক্ষা নেওয়ার এমন মজার যন্ত্রবন্ধু আর হয় না ! এর পরও কি তুমি বলবে যে তোমার কম্পিউটার সম্পর্কে কিছুই জানার দরকার নেই ? অন্তত কম্পিউটার নিয়ে হাজাররকম বিভ্রান্তি দূর করতে প্রত্যেকেরই থাকা দরকার এ-বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান ।

কম্পিউটার-সাক্ষরতা

পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশের সঙ্গে আমাদের দেশও কম্পিউটার-সাক্ষরতার কার্যক্রম নিয়েছে । আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে কম্পিউটার । তাই সকলের, বিশেষ করে ছাত্রদের, কম্পিউটার সম্পর্কে পড়া, কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখা আর কম্পিউটারের সঙ্গে সরাসরি পরিচয়ের ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । একেই বলা হচ্ছে কম্পিউটার-সাক্ষরতা । এই লেখাটিতে তাই প্রথমে বলা হয়েছে কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে । এর পরে বলা হবে কী দিয়ে তৈরি হয়েছে এর আশ্চর্য দেহ অর্থাৎ হার্ডওয়্যার আর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে কাজ করা সফটওয়্যার । এই আলোচনা পড়ে তুমি কম্পিউটার সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারবে । তারপরে আমরা আলোচনা করব কম্পিউটারের ভাষা নিয়ে, যা দিয়ে প্রোগ্রাম লিখে কম্পিউটারকে দিয়ে মজার মজার নানারকম কাজ করাতে পারবে । সাক্ষরতার তৃতীয় ধাপ, মানে কম্পিউটারের সঙ্গে সরাসরি পরিচয় করতে পারো স্কুলের কম্পিউটারে, পি·সি· ক্লাবগুলিতে অথবা অল্প দামের হোম কম্পিউটারে । কীভাবে তাদের চালাতে হবে তা নিয়েই আমরা আলোচনা করব ।
তবে এটাই সব নয়, ভাষা নিয়ে আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিটি লেখায় থাকবে কম্পিউটার-বিজ্ঞানের নানা কথা, আর কীভাবে দারুণ সব প্রোগ্রাম লেখা যায় তার উপায় ।

কম্পিউটার কীভাবে এল

কঠিন-কঠিন যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগ

কম্পিউটার কীভাবে এল

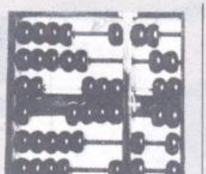

অ্যাবাকাস

অ্যাবাকাস যান্ত্রিক গণনার শুরু ।

৫০০ খ্রিস্টাব্দ
শূন্যের ধারণার জন্ম ।

১৪৯২
দশমিকের আবিষ্কার ।

১৫০০
সোরোবান-অ্যাবাকাস চিন থেকে জাপানে এল ।

১৬১৭
নেপিয়ারের দণ্ড ও হাড় ।

নেপিয়ারের গণকযন্ত্র তৈরির ছক

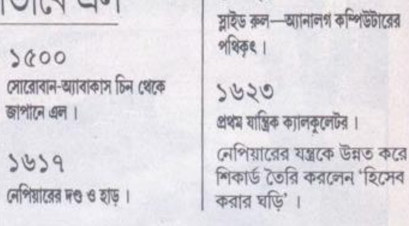

১৬২১
স্লাইড রুল—অ্যানালগ কম্পিউটারের পথিকৃৎ ।

১৬২৩
প্রথম যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর ।

নেপিয়ারের যন্ত্রকে উন্নত করে শিকার্ড তৈরি করলেন 'হিসেব করার ঘড়ি' ।

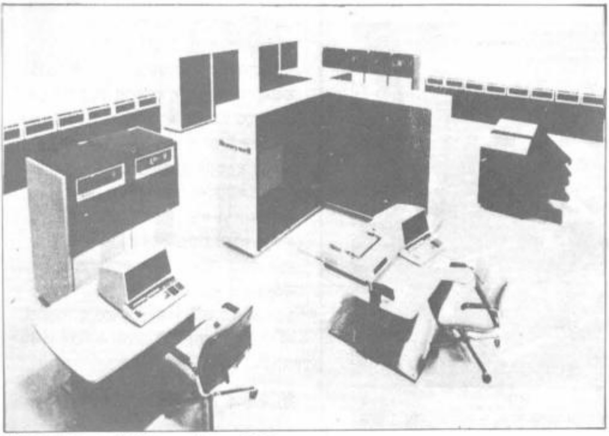

খুব বড় মেন ফ্রেম কম্পিউটার : হানিওয়েল ডি পি এস ৮৮/৮১

করতে কারই বা ভাল লাগে ! আজকের মতোই হাজার বছর আগের মানুষও ভাবত, "এমন একটা যন্ত্র যদি থাকত যা চোখের নিমেষে অঙ্ক কষে দিতে পারত !" চেষ্টা করতে-করতে নীল নদের দেশ ইজিপ্টের লোকেরাই প্রথম এইরকম এক পদ্ধতি আবিষ্কার করে । যন্ত্রটার নাম অ্যাবাকাস । এতে পাশাপাশি টানটান করে বাঁধা কয়েক সারি তার থাকে । প্রতিটি তারকে বেষ্টন করে রাখে দশটি করে মাটির বল । সবচেয়ে ওপরের তারটি হল এককের ঘর, তার নীচেরটি দশকের ঘর, তারও নীচেরটি শতকের ঘর···এইভাবে চলতে থাকে । ২৩৪ সংখ্যাটি বোঝাতে ওপরের তারে চারটি, তার নীচের তারে তিনটি, তারও নীচের তারে দুটি বল তারগুলির ডান প্রান্তে নিয়ে যেতে হবে । বলগুলি সরিয়ে-সরিয়ে যোগ বা বিয়োগ করা যায় । ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ও গোলমেলে মনে হলেও দক্ষ লোকরা এই যন্ত্র দিয়ে ভীষণ দ্রুত গতিতে অঙ্ক কষতে পারত । ফোটো দেখে পুঁতি আর সুতো দিয়ে একটা অ্যাবাকাসের মডেল তৈরি করতে পারো ।

নেপিয়ারের দণ্ড

জটিল গোনাগুনির কাজ করতে-করতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জন নেপিয়ার । সময়টা ছিল সতেরো শতকের একেবারে গোড়ার দিক । ওঁর চিন্তাভাবনা থেকে তৈরি হল 'নেপিয়ারের দণ্ড'— ন' ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া একটি কার্ডকে ন' ভাগে ভাগ করা হল । তৈরি হল ন'টি বর্গক্ষেত্র । এদের প্রত্যেকটিকে কোনাকুনি বিভক্ত করা হল । ন'খানা লম্বা কার্ডে ওপর-নীচে পর পর এক থেকে ন'-এর ঘরের নামতা লিখে ফেলা হল । একটা উদাহরণ দেওয়া যাক । ৪,৫৮৭ এই সংখ্যাটিকে ৮৬৩ দিয়ে গুণ করতে গেলে পাশাপাশি ৪, ৫, ৮ এবং ৭ নম্বর কার্ডগুলি রেখে ওপর থেকে নীচে ৩, ৬ এবং ৮ নম্বর ঘরে লেখা সংখ্যাগুলি পর পর যোগ করলে তিনটি সংখ্যা পাওয়া যাবে । এদের জুড়লেই পাওয়া যাবে গুণফল ।

পাস্কালের যোগ করার যন্ত্র

১৬৪২ সালে ব্লেইজ পাস্কাল মাত্র

শিকার্ডের ক্যালকুলেটর

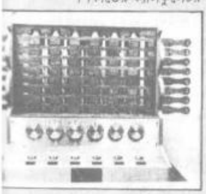

প্রথম স্লাইড রুল

১৬৪২
প্রথম স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর ।

১৬৫৪
প্রথম লম্বা স্লাইড রুল ।

১৬৬৬
প্রথম গুণ করার যন্ত্র ।

সার স্যামুয়েল নোরল্যান্ডের তৈরি এই যন্ত্রে যোগ-বিয়োগ ছাড়া গুণ-ভাগও করা যেত ।

১৬৯৪
প্রথম সব কাজের গণকযন্ত্র ।

১৮০৪
প্রথম পাঞ্চকার্ড যন্ত্র ।

রেশম বোনার কাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথমে বুশঁ ও পরে ফালকন ছিদ্র করা কাগজ ব্যবহার করেন । সেই নীতি মেনে যোসেফ মারি জ্যাকার্ড এই যন্ত্র তৈরি করেন ।

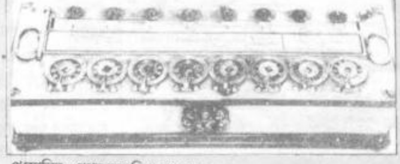

পাস্কালিন : প্রথম স্বয়ংক্রিয় গণকযন্ত্র

১৭৭৭
প্রথম যুক্তিযন্ত্র ।

চার্লস ম্যাহনের ছোট্ট আর সহজ-সরল এই যন্ত্রটি কিছু-কিছু যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে পারত । কম্পিউটার ছাড়াও নানারকম গণকযন্ত্রকে এটি দারুণভাবে সাহায্য করে ।

১৮২০
প্রথম বাণিজ্যিক গণকযন্ত্র ।

ছবি : দেবাশিস দেব

লেখাপড়ার ক্ষেত্রে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিতে চলেছে কম্পিউটার। আর কয়েক বছর পরে কম্পিউটারই হয়ে উঠবে বই, খাতা, এমনকী শিক্ষকও। লক্ষ-লক্ষ কম্পিউটারের নেটওয়ার্কের সাহায্যে লেখাপড়ার কাজ চলবে। ঘরে বসেই তখন আমরা পড়া বুঝে নিতে পারব। কম্পিউটারই আমাদের পড়া ধরবে। সে-ই পরীক্ষা নেবে। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই কাল্পনিক নয়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে এইভাবে পড়াশোনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

আঠারো বছর বয়সে পৃথিবীর প্রথম যোগ করার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। দশটি অংশযুক্ত অনেকগুলো নানা মাপের হুইল (খাঁজকাটা চাকার মতো জিনিস) এমনভাবে সাজানো হল যে, একটি দশবার ঘোরা সম্পূর্ণ করলেই পরেরটি একপাক ঘুরে যাবে। এর ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগ করা সম্ভব হল।

লিবনিজের গণনা করার যন্ত্র

১৬৯৪ সালে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করার জন্য এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন গটফ্রিড লিবনিজ। এখানে একটা ড্রামের গায়ে কয়েক সারি দাঁতের মতো জিনিস লাগানো থাকত। এদের সাহায্যে ড্রামের ঘোরার ওপর নির্ভর করে অঙ্ক কষা হত। এর প্রায় দেড়শো বছর পরে টমাস দ্য কোলমার প্রথম বাণিজ্যিকভাবে ক্যালকুলেটিং মেশিন বা গণনা করার যন্ত্র তৈরি করেন। সুইডেনের ওডনারের তৈরি ক্যালকুলেটিং মেশিনের নীতিতে আজও কিছু-কিছু ক্যালকুলেটর তৈরি হয়। আলেকজান্ডার বারো এর আরও উন্নতি করেন।

আটটি ভাষায় লিখতে পারে এই কম্পিউটার

চার্লস ব্যাবেজের ডিফারেন্স এঞ্জিন ও অ্যানালিটিকাল এঞ্জিন

চার্লস ব্যাবেজকেই আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয়। ১৮২২ সালে ডিফারেন্স এঞ্জিনের সফল প্রদর্শনী হয়।
সে-সময়ে ভাবাও যায় না, এমন সব উচ্চাশা নিয়ে তিনি তৈরি করতে আরম্ভ করেন অ্যানালিটিকাল এঞ্জিন নামে এক যন্ত্র। প্রোগ্রামিং-এর সুযোগ, আজকের কম্পিউটারের মতো স্মৃতির ব্যবস্থা ও গাণিতিক ব্যবস্থার সমন্বয়ে তৈরি এই যন্ত্রটির কল্পনা করেন। প্রায় দেড়শো বছর আগে এই প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিতে ব্রিটিশ সরকার তিন লক্ষাধিক টাকা খরচ করেন। সাফল্য না আসায় সরকারি সাহায্য বন্ধ হল। ব্যাবেজ নিজের খরচে গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৮৭১ সালে তিনি যন্ত্রটির সম্পূর্ণ পরিকল্পনাও করে যেতে পারলেন না— কিন্তু রেখে গেলেন কয়েক হাজার নকশা। এ-ঘটনার প্রায় পঁচাত্তর বছর পরে ১৯৪৪-এ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাবেজের পরিকল্পনার অনেকটাই কাজে লাগিয়ে প্রথম আধুনিক কম্পিউটার তৈরি হয়।

জ্যাকার্ডের পাঞ্চকার্ড

একটি কার্ডকে নির্দিষ্ট কয়েকটি ফুটো করার মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট সঙ্কেত প্রকাশ করা সম্ভব হয়। ডঃ হোলেরিথই প্রথম ডাটাপ্রসেস করার কাজে পাঞ্চকার্ড ব্যবহার করেন। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এভাবেই কম্পিউটারকে তথ্য সরবরাহ করা হত।

আধুনিক কম্পিউটার

ব্যাবেজের পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি হল আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৪৪) অটোমেটিক সিকোয়েন্স কন্ট্রোল্ড ক্যালকুলেটর। এটি প্রথম আসল কম্পিউটার। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৪৬) প্রথম সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহারকারী এনিয়াক (ইলেকট্রনিক নিউমেরিকাল ইনটিগ্রেটর অ্যান্ড ক্যালকুলেটর) নামে ৩০ টন ভারী, ১৫০০ বর্গফুট মাপের কম্পিউটারটি তৈরি করা হয়। এখানেই এর পর তৈরি হয় এডভ্যাক নামে আরও দক্ষ কম্পিউটার। এর পরে আসে আই·বি·এম ৬০৪, ৭০১, ৬৫০, লিও, ম্যাডাম, আর্ক, ইউনিভ্যাক-ওয়ান, ডিউস ইত্যাদি কম্পিউটার।
পঞ্চাশের দশকের শেষে (১৯৫৮) ইলেকট্রিক ভাল্‌ভের জায়গা নেয় ট্রানজিস্টর। হানিওয়েল, ন্যাশনাল ৩০৪, আর· সি· এ ৫০১ এই সময়ের কম্পিউটার। এর পরে এল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, লার্জস্কেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ও ভেরি লার্জস্কেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট-ওয়ালা কম্পিউটারেরা। আধুনিক কম্পিউটারের এই বিবর্তনকে কয়েকটি প্রজন্মে ভাগ করা হয়েছে। (ক্রমশ)

ক্যাম্পাস

অভিযানের আনন্দ আছে ভ্রমণেই

শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা সব স্কুলেই থাকে । কিন্তু দমদমের 'কিশোর ভারতী' স্কুলের শিক্ষামূলক ভ্রমণ একটু অন্যরকমের । এই স্কুলের প্রধানশিক্ষক মিহির সেনগুপ্তের অভিমত হল—গতানুগতিক শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা না করে ছাত্রদের নিজেদের গণ্ডির বাইরে বিশাল প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে । ভ্রমণের মধ্যেই তারা যেন পায় অভিযানের আনন্দ । বাইরের জগতকে চেনা-জানার দরকার ছেলেদের । তাই ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে উৎসাহী শিক্ষকরা বেরিয়ে পড়েন বনে-জঙ্গলে, দুর-দূরান্তে, গ্রামে । ট্রেকিং-এর শুরু হয়েছে ১৯৭২ সালে । মিহিরবাবু পাহাড় ভালবাসেন নিজে । তাই দুর্গম, উত্তুঙ্গ পাহাড়ে ওঠার জন্য বেরিয়ে পড়েন ছাত্রদের নিয়ে মাঝে-মাঝে । সবচেয়ে বড় এবং রোমাঞ্চকর ট্রেকিং করেছিল এই স্কুলের ছাত্ররা হিমালয়ের রূপকুণ্ডে, ১৯৭৪ সালে । এরকম দুঃসাহসিক অভিযানে ছেলেদের পাঠাতে অভিভাবকদের উৎসাহও কম নয় । দক্ষিণ কলকাতার ইয়ুথ হস্টেল অ্যাসোসিয়েশন তাদের 'অ্যাডভেঞ্চার কাম নেচার স্টাডি' ক্যাম্পে কিশোর ভারতী স্কুলকে তাই আমন্ত্রণ জানায় । এরকম ক্যাম্পে সেন্ট লরেন্স, সাউথ পয়েন্ট, লরেটো ডে (শিয়ালদহ), সিস্টার নিবেদিতা, নাকতলা হাই স্কুলের ছেলেমেয়েরাও যোগ দেয় । কিশোর ভারতী স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র পুনর্বসু চৌধুরী তার অভিজ্ঞতার কথা বলছিল । "দু' রাত্রি জঙ্গলের মধ্যে প্লাস্টিকের তাঁবু খাটিয়ে থাকতে ভয় করলেও ভীষণ আনন্দ পেয়েছি । জঙ্গলের মধ্যে একা কী করে বাঁচতে হবে—জানা ও শেখা হয়ে যায় এই ক্যাম্পে ।" পুনর্বসুরই সহপাঠী জয়ন্ত পাল । সেও তিনবার ক্যাম্প করেছে । জয়ন্ত বলল, "ট্রেকিংয়ের আনন্দ একেবারেই অন্যরকম । পড়াশোনার সঙ্গে-সঙ্গে এরকম ক্যাম্পে লাভ হয় আমাদের বেশি ।" এই স্কুলের ছাত্ররা এ-ধরনের ট্রেকিংয়ে খুব আনন্দ পায় । ছাত্রদের কাছে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ছিল গাড়োয়াল হিমালয়ে অভিযান । 'খেলু' পর্বতশৃঙ্গে (১৬, ৬৯৫ ফুট উচ্চতা) যেবার এই স্কুলের শিক্ষক সঞ্জীব গোলুই ও ছাত্র সৌম্যদীপ সাহারায় ভারতের জাতীয় পতাকার সঙ্গে এই স্কুলের পতাকা তুলেছিলেন, সেই দিনটি স্মরণীয় হয়ে আছে ।

পাহাড়ে চড়ার ব্যাপারে ছাত্রদের উৎসাহও ভীষণ । গত বছর পাহাড়ে চড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র কৌশিক রায় ।

ছাত্র-শিক্ষক দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েন পাহাড়ের আকর্ষণে

কৌশিক বলল, "তিনজন ছেলের মধ্যে এই অভিযানে ছিলাম আমিও । সুন্দরডাঙা ভ্যালির 'ভালোটি' শিখরে উঠেছিলাম । এই শিখরে উঠতে ভয় ছিল না, কিন্তু কৌতূহল ছিল ।"

শুধু অ্যাডভেঞ্চারই নয়, এই স্কুলের ছেলেরা গাছ লাগায়, নাগের বাজার রথের মেলায় তৃষ্ণার্তদের জলদান করে, ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ক্লাস করে । প্রতি বছর জুলাই মাসে ছাত্ররা সমারোহের সঙ্গে পালন করে বৃক্ষরোপণ উৎসব । ১৯৭০ সাল থেকে রক্তদান শিবির করছে ছাত্ররা । প্রতি বছর ১৬ জানুয়ারি স্কুলের প্রতিষ্ঠাদিবসে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ২ অক্টোবর গান্ধীজির জন্মদিনে অষ্টম থেকে

ট্রেকিং-এর পথে বিশ্রাম

দশম শ্রেণীর ছাত্ররা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শহর পরিষ্কার করে । প্রধানশিক্ষক বলেন, "ছাত্রদের শারীরিক বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে এইসব কাজের মধ্য দিয়ে তাদের মানসিক বিকাশ এবং সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলছি আমরা ।"

ইন্দিরা রায়

খেয়ালখুশির ছবি

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মুলকরাজ

পাঁচ থেকে পনেরো বছরের প্রায় ২৫০ জন অনাথ, অবহেলিত ছেলেমেয়েকে নিয়ে 'বসে আঁকো' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন কলকাতার জাদুঘর কর্তৃপক্ষ । 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি' এবং উত্তর কলকাতার 'জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র' এনেছিলেন ছেলেমেয়েদের । জাদুঘর দেখানোর পর বলা হয়েছিল 'যে-যার মতো যেমন খুশি ছবি আঁকো' । ছেলেমেয়েরা কিন্তু সকলেই জীবজন্তু বা জাদুঘরে যা দেখছে, তা আঁকেনি । এঁকেছে ফুল, পাখি, প্রজাপতি ।

প্রখ্যাত লেখক এবং চিন্তাবিদ মুলকরাজ আনন্দ ভারতীয় জাদুঘরের একজন পরিদর্শক । তিনি ১ ফেব্রুয়ারি জাদুঘর পরিদর্শনে এসেছিলেন । তিনি গিয়ে মিশে যান ছোটদের মধ্যে । ওদের সঙ্গে বসে তিনি নিজেও ছবি আঁকেন । তিনি বলেন, "জাদুঘর কর্তৃপক্ষের এই আয়োজন স্মরণীয় হয়ে থাকবে ।" এইসব ছেলেমেয়ের আঁকা ছবি থেকে ১৫টি ছবি বেছে নেওয়া হয় পুরস্কারের জন্য ।

রতনতনু ঘাটী

ফোটো : অশোক চক্রবর্তী

সম্পূর্ণ উপন্যাস

রহস্যের আলোছায়া

আনন্দ বাগচী

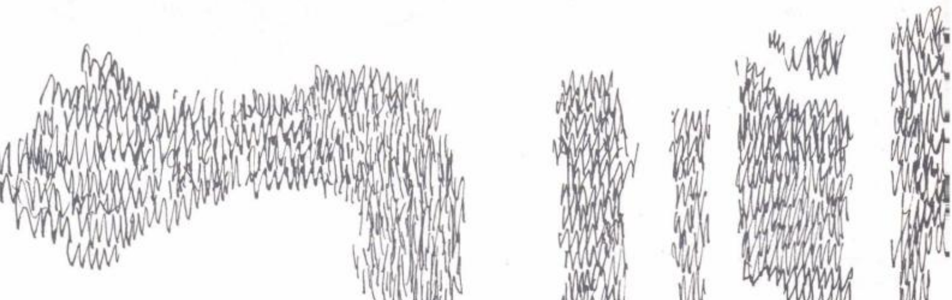

জানলার সামনে দিনের উজ্জ্বল আলোয় মোড়ক খুলে দেখা গেল যে-পোকাগুলোকে তখন তাড়াহুড়োয় মরা বলে মনে হয়েছিল, তারা সামান্য নিস্তেজ হলেও মরেনি। সংখ্যায় গুটি-পাঁচেক হবে, খুদে আকারের মাছির মতো সাইজ, হালকা খয়েরি রঙের পাখায় ঢাকা পিঠ।

"কী পোকা রে এগুলো ?" অমিয় জিজ্ঞেস করে।

সুনন্দও চেনে না, মাথা নাড়ল। বলল, "কোনও একজাতের বুনো পোকা হবে বোধ হয়। ডানা আছে যখন উড়তেও পারে নিশ্চয়।"

"কিন্তু উড়ে পালাচ্ছে না তো !"

"কীরকম নিস্তেজ হয়ে পড়েছে দেখছিস না। ওড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে খুব সম্ভব। কিংবা..."

"এর পরে আবার কিংবা কী !" অমিয় বিজ্ঞের মতো মাথা দোলায়, "যা বলেছিস এগজাক্টলি তাই।"

"কিংবা এই পোকাগুলো যদি দেওয়ালিপোকার মতো কোনও নিশাচর জাতের হয় ? দিনের আলোয় হয়তো দেখতে পায় না। প্যাঁচা কিংবা বাদুড় যেমন দিনের আলোয় ব্লাইন্ড হয়ে যায়, চক্ষু থাকতেও অন্ধ, একেবারে নট নড়ন-চড়ন অবস্থায় ঝিমোয় !"

"সে যাই হোক," অমিয় চিন্তিত মুখে বলে, "এগুলো ভদ্রলোকের পকেটে ঢুকেছিল কেন ? এবং কীভাবে ? এগুলো ফুলের পোকা নয় তো ? ওঁর পকেটের কাছে বাটনহোলে একটা গোলাপ ফুল ছিল। তার গন্ধে কি..."

সুনন্দ কিছু ভাবছিল। অমিয়র কথার উত্তরে বলল, "পোকাগুলোকে শনাক্ত না করা পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তই আমরা নিতে পারছি না। পোকামাকড় যারা চেনে তাদের কাছে আগে যেতে হবে। তারপর অন্য কথা ! তুই একটা জিনিস লক্ষ করেছিস ?"

"কী জিনিস ?"

"ওয়ার্ডরোবের তলার তাকে একটা ছৌ-নাচের মুখোশ ছিল।"

"দেখেছি। তবে শুধু মুখোশ কেন, আরও কিছু উপহার পাওয়া জিনিসও সেখানে ছিল।"

"যেমন ?"

"একটা নেপালি কুকরি, একটা সাঁওতালি আড়বাঁশি, কিছু রংবেরঙের নুড়ি—এইসব।"

সুনন্দ বলল, "ওগুলো যে উপহার পাওয়া তুই কী করে জানলি ? কিনতেও তো পারেন ! কী, পারেন না ?"

"ধ্যাত ; ওসব আবার কেউ কেনে নাকি ! বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে অবশ্য কারও কারও সুভেনির সংগ্রহের বাতিক থাকে। তবে ডঃ চিন্ময় মুস্তাফিকে সেই ধরনের মানুষ বলে আমার মনে হয় না। উনি এ-সব অঞ্চলে যে নতুন নন, এ-কথা তো শুনলিই। এইসব হাবিজাবি জিনিসপত্র উনি এতকাল পরে হঠাৎ কিনতে যাবেন কেন ?"

সুনন্দ তারিফের চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, "বাঃ, এই তো, তোর মগজ খুলে গেছে। গোয়েন্দাদের মতো ডিটেকশন আর ডিডাকশন দুটোই করতে শিখে গেছিস। তা হলে মোদ্দা কথাটা দাঁড়াল গিয়ে এই ওগুলো কেউ তাঁকে ভালবেসে উপহার দিয়েছিল। আর উপহারগুলো যে এই অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ থেকে এসেছে এমনই ভাবতে হয়। তবে চিন্ময়বাবু জিনিসগুলো নিতে হয় তাই নিয়েছেন, কিন্তু ফেলে দেননি যেমন, তেমনই যত্ন করেও রাখেননি। হেলাফেলায় ওয়ার্ডরোবের তলায় স্তূপাকার করে রেখেছেন। আর তা রেখেছেন বলেই মোক্ষম জিনিসটি তোর চোখে পড়েনি। তোর আইসাইট খারাপ কিংবা আই কিউ কম বলব না।"

"মোক্ষম জিনিস বললি, সেটা কী ?"

"একটা কাজ-করা বাঁশের চোঙায় অন্তত হাফ ডজন ধনুকের তীর। অর্থাৎ তূণে ভরা মৃত্যুবাণ।"

"তাই ? কিন্তু তুই মৃত্যুবাণ কেন বললি ?"

"বললাম এইজন্য যে, ঠিক ওই ধরনের একটা তীর ছুঁড়েই কেউ চিন্ময়বাবুর হার্ট ফুটো করে চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। আমি একই ধরনের পাখির পালক তীরের গোড়ায় গাঁথা রয়েছে তা দেখে নিয়েছি। শুধু তুই না, জীবন হায়দারের মতো ঝানু পুলিশ অফিসারও ব্যাপারটা নজর করলেন না কিংবা গুরুত্ব দিলেন না সেটা আমি খেয়াল করেছি। যাকগে ওসব। কিন্তু আমাদের মনে হতেই পারে যে, চিন্ময়বাবুর হত্যার পিছনে কোনও আদিবাসীর হাত আছে। যদি তাই হয় তবে বলতেই হবে, সেই লোকটার হাতের নিশানা একেবারে নির্ভুল। অন্ধকারের মধ্যেও দূর থেকে সে ঠিক লক্ষ্যভেদ করেছে। আর তা করেছে বলেই সেই ধানুকীকে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় কোনও বাণ ছুঁড়তে হয়নি। নিজের ওপর তার বিশ্বাস এতই দৃঢ়।"

"কিন্তু আদিবাসীরা হঠাৎ কেন চিন্ময়বাবুর ওপর..."

"সেইটেই তো কথা ! হায়দার সাহেব তো স্পষ্টই বললেন, এই অঞ্চলের আদিবাসীরা খুব সেন্টিমেন্টাল, এদের মনস্তত্ত্ব খুব জটিল। খেপে গেলে আইন-ফাইনের পরোয়া করে না। যাকগে, চল, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।"

সুনন্দ তার হাতের পোকাগুলোকে পোর্সিলিনের পরিষ্কার অ্যাশট্রের মধ্যে রেখে জলের গেলাস ঢাকার নেটের চাকতি চাপা দিয়ে মজা করে বলল, "বৎসগণ, তোমরা খুব পরিশ্রান্ত, আপাতত বিশ্রাম করো। তোমাদিগকে এই মুহূর্তে কোনওপ্রকার খাদ্য-পানীয় দিতে পারিতেছি না, তজ্জন্য আমরা অতীব দুঃখিত।"

অমিয় ওর কথা শুনে হোহো করে হেসে উঠে বলল, "এই সুনন্দ, পরীক্ষার খাতায় তুই কি সাধুভাষায় উত্তর লিখিস ?"

সুনন্দ হেসে জবাব দিল, "না, অসাধু !"

প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়া একটা পোড়ো চালাঘরের দিকে এগোচ্ছে দেখে অমিয় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার ? তুই কি ওর মধ্যে ঢুকবি নাকি ? আমি ভেবেছিলাম নদীর দিকে বেড়াতে যাবি।"

"যাব। তার আগে চল না ঘরের ভেতরটা একটু উঁকি মেরে যাই।"

জলহাওয়া পালটে যাচ্ছে দিনকে-দিন। এই সেপ্টেম্বরেও, পুজো প্রায় এসে গেল, তবুও ঠাণ্ডা পড়ল না। রাতেও ফ্যান চালাতে হয়। এখন এই বেলায় রোদের বেশ তাত বেড়েছে। কুলঝোপ আর আকন্দর জঙ্গল পেরিয়ে ছায়া-ছায়া আধো অন্ধকার ঘরের ভেতর ঢুকে

বেশ আরাম লাগল। বাড়িটার একেবারেই জীর্ণদশা। মেঝেতেও আগাছা জন্মে গেছে। এখানে-ওখানে মেঠো ইঁদুর কিংবা সাপের গর্ত, কে জানে!

সুনন্দ বলল, "এই, সাবধানে কিন্তু, সাপখোপ থাকতে পারে!" বলেই পকেট থেকে প্লাস্টিকের চ্যাপটা ছোট্ট একটা টর্চ বের করে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল। আলোর দরকার ছিল না, ছায়ায় চোখ সয়ে এসেছিল এরই মধ্যে। তবু যদি দরকার হয় সুনন্দ তৈরি হয়েই এসেছিল, অমিয় বুঝতে পারল। শুধু বুঝতে পারল না, এখানে ও কী খুঁজতে এসেছে।

সুনন্দ কি মনের কথা টের পেয়ে যায়? বলল, "কী আর, কিছুই খুঁজতে আসিনি রে। আমার কেমন মনে হল, আমাদের তীরন্দাজমশাই এখান থেকেই তীরটা ছুঁড়েছিল। শুধু তাই নয়, সকালে যখন আমরা ওই স্পটে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার কেমন মনে হয়েছিল লোকটি তখন এখানেই ঘাপটি মেরে আমাদের ওপর নজর রাখছিল। অবশ্য এটা আমার মনের ভুলও হতে পারে।"

সুনন্দর কথা শুনে অমিয়র গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল। সতর্ক চোখে ও একবার চারপাশটা চকিতে দেখে নিল। না, ঘরের ভেতর এখন তারা ছাড়া আর কেউ নেই। ভাঙাচোরা বেড়ার গা বেয়ে কাঁটালতা লকলকিয়ে উঠেছে। দরজা-জানলায় পাল্লার বালাই নেই। দুটো জানলার একটা বুনো শিমলতার ঝাড় উঠে একেবারে ঢেকে ফেলেছে, অন্যটা দিয়ে রোদ্দুর আসছিল। কিন্তু সেটাতেও মাকড়সার জালের মশারি নেমেছে। চোখে পড়ল,সুনন্দ হঠাৎ মেঝে থেকে কিছু কুড়িয়ে পকেটে ভরল।

"কী পেলি?"

সুনন্দ প্রথমে উত্তর দিল না। খোলা জানলাটার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বলল, "ও কিছু না। এদিকে আয়, একটা জিনিস দেখে যা।"

অমিয় দেখল সুনন্দ একমনে জানলাটা দেখছে। অমিয় এগিয়ে এসে সুনন্দর কাঁধে হাত রেখে বলল, "কী?"

"ভাল করে দ্যাখ তো। কিছু চোখে পড়ছে?"

"না। শুধু মাকড়সার জাল।"

"মাকড়সার জালটার কোনও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে?"

একটু সময় নিয়ে অমিয় বলল, "না না! কোনও নতুনত্ব তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। মাকড়সার জাল যেরকম হয় আর কি। পুরনো, ঘন বুনোট, ধুলোফুলো জড়িয়ে খানিকটা ঝুলের মতো হয়ে আছে।"

"খুব পুরনো তাই না? কী করে বুঝলি?"

"বাঃ, এ তো চোখেই দেখা যাচ্ছে। এই দ্যাখ না মাঝখানটা কেমন ছিঁড়ে ঝুলে আছে।"

"কিন্তু ছিঁড়ল কেন?"

"তুই না সব ব্যাপার নিয়ে বড্ড 'কেন, কিন্তু' করিস। পুরনো জাল ছিঁড়ে গেছে, তাও কেন ছিঁড়ল!"

"কেন-কিন্তু করার একটা কারণ আছে ভাই, জালটা একটু অদ্ভুতভাবে ছিঁড়েছে, ছিঁড়েছে ঠিক মাঝখানটায়। সাধারণত কী হয়, পাশ থেকে ছেঁড়ে। তাই না?"

এসব ব্যাপারে অমিয়র কোনও ধারণা ছিল না ; তাই সে কোনও কথা বলল না।

"আমি যদি বলি," সুনন্দই আবার কথা বলল, "এই জানলা দিয়েই তীর ছোঁড়া হয়েছিল, তা হলে তুই নিশ্চয়ই আপত্তি করবি না। কারণ চিন্ময়বাবু যে পথ দিয়ে আসছিলেন এবং যেখানে পৌঁছে তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন, সেই জায়গাটা এখান থেকে এক সরল রেখায়। দূরত্ব এখান থেকে খুব বেশি হলে বারো থেকে পনেরো গজ হবে। বাড়িটা উঁচু ঢিপির ওপর হলেও যে জমি থেকে এই টিলাটা উঠেছে সেটা ওই ঝাউবনের রাস্তার তুলনায় অনেকটা নিচু। আর তার ফলে এই ঘর থেকে ওই জায়গাটা প্রায় এক লেভেলে দেখা যাচ্ছে। অমিয়, সকালে যখন আমরা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ডেডবডিটা দেখছিলাম তখন তুই হয়তো লক্ষ করিসনি, কিন্তু আমি দেখতে পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"সাসপেন্সে রাখিস না, তুই হঠাৎ হঠাৎ বেজায়গায় ব্রেক কষে থেমে যাস কেন বল তো? কী দেখতে পেয়েছিলি?"

"তীরের গোড়ায় ছাঁটা পালকগুলোর গায়ে মাকড়সার জালের মতো কী যেন জড়িয়ে রয়েছে। প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি, অনেক ভেবে-ভেবে শেষে ব্যাপারটা খানিকটা আন্দাজ করেছিলাম।"

"দারুণ!" অমিয় সুনন্দর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেক করার জন্য।

"চল, এবার নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে হলিডে হোমে ফিরে যাই।"

ওরা সবে দরজার কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছে, অমনি পিছনে আচমকা একটা শব্দ হল। দু'জনেই চমকে গিয়েছিল খুব। সুনন্দ ঘুরে দাঁড়িয়েই এক লাফে ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় ফিরে এল। কিন্তু ঘরের ভেতর কাউকে দেখতে পেল না। অমিয় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "সুনন্দ, এই দ্যাখ!"

ঘরের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে শালের খুঁটিটা আছে তার গায়ে ফুট আড়াই লম্বা একটা তীর বিঁধে আছে। আগে ছিল না। সুনন্দ

হাতের টর্চটা ফোকাস করেই বুঝতে পারল তীরটা সদ্য ছোঁড়া হয়েছে, কারণ তীরের গোড়ার দিকটা তখনও তিরতির করে কাঁপছে।

"ঝট করে বসে পড় !" বলেই সুনন্দ নিজেও মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে পড়ল। তারপর বসে-বসেই জানলার দিকে এগিয়ে গেল। তীরের গতিপথ আন্দাজ করা কঠিন নয়, জানলা দিয়েই ওটা এসেছে। জানলার কাছে পৌঁছতে সামান্য সময় লেগেছিল নিশ্চয়। কিন্তু ওইটুকু সময়ই বোধ হয় লোকটার পক্ষে যথেষ্ট। জানলার তলা থেকে মাথা উঁচু করে সুনন্দ যখন বাইরে তাকাল তখন সব ভোঁভাঁ। কোথাও কেউ নেই। দূরের ঝাউবন যতদূর দেখা যায় সুনসান। বনের ভেতরে কেউ যদি গিয়ে লুকিয়ে পড়ে থাকে তবে তাকে দেখতে পাওয়ার কথাও নয়। সুনন্দ বলল, "ব্যাটা পালিয়েছে !"

অমিয় খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। তার হাত-পা কাঁপছিল। সে শুকনো গলায় বলল, "ইস, খুব বেঁচে গেছি ! জানলা থেকে ফিরে আসতে আর কয়েক সেকেন্ড দেরি হলেই কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটে যেত তুই ভাব !"

খুঁটির গা থেকে তীরটা খুলে নেবার চেষ্টা করছিল সুনন্দ। কিন্তু সহজে কি খোলা যায় ! তীরের তীক্ষ্ণ ফলাটার প্রায় বারো আনাই খুঁটির ভেতর গেঁথে গিয়েছিল। সুনন্দ তীরের ফলাটাকে দু'পাশে নাড়িয়ে আলগা করতে করতে বলল, "হ্যাঁ, আমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ একজন নির্ঘাত খতম হয়ে যেতাম। যে প্রচণ্ড গতিতে এটা এসেছে, ভাবাই যায় না !"

"তার মানে খুঁটিটাই আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমরা খুঁটির এপাশে চলে এসেছিলাম তাই রক্ষে। নইলে দরজার কাছে পৌঁছেও আমরা বাঁচতে পারতাম না !"

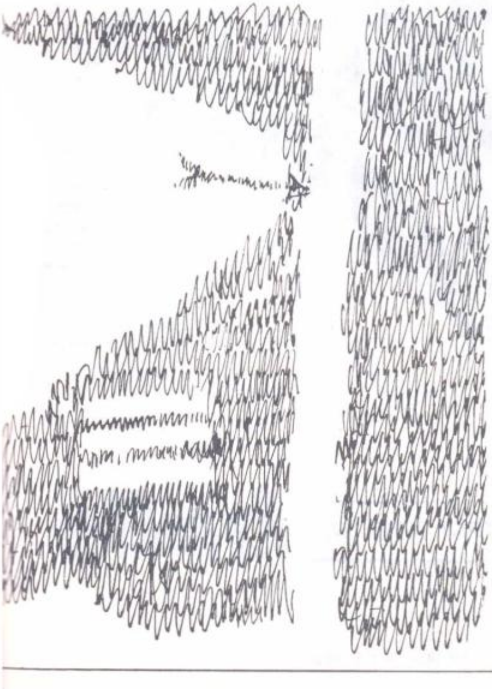

এরকম মুহূর্তেও সুনন্দ হেসে ফেলল। বলল, "ইয়েস, একেই বলে খুঁটির জোর !"

থানার ওপর তলায় জীবনের কোয়ার্টার। তেমন দরকার না পড়লে নীচে নামে না, টেলিফোনেই কাজ সারে। ওর ধারণা, মানুষ কাজ করে মগজ দিয়ে, শরীরটা শুধু হুকুম তামিলের যন্ত্র। তবু ক'দিন তাকে কম ছুটোছুটি করতে হয়নি। তাঁতের মাকুর মতো ঘরে-বাইরে কোথাও এক দণ্ড স্থির হয়ে বসেনি, নাওয়া-খাওয়া কখন করেছে সে নিজেই জানে না। তার ওপর ট্রাঙ্ককল, টেলিফোনের বিরাম ছিল না। জীবনের বাইরের চেহারায় শিল্পী - শিল্পী ভাব থাকলেও, পোশাক-আশাক, ভাবভঙ্গি ঢিলেঢালা হলেও, আসলে সে একটি তরুণ রয়্যাল বেঙ্গল। বাঘের মতো দ্রুতগতি, বাঘের মতোই নিঃশব্দ। ঘটনার আগে-আগে দৌড়নোই তার স্বভাব। পূর্ব বঙ্গের রক্ত তার শরীরে। তাই বোধ হয় ভীষণ একগুঁয়ে আর জেদী। জেদী কিন্তু যুক্তিবাদী, ক্ষিপ্র অথচ ধীর-বুদ্ধির মানুষ। যে-কোনও ব্যাপারের একেবারে তল পর্যন্ত না দেখে ছাড়ে না। পুলিশের চাকরি হলেও সে একটু অন্যরকম, ছাঁচে ঢালা অফিসার না। অবসর সময়টা ঘুমিয়ে আর ক্লাবে গিয়ে কাটায় না, গানবাজনা আর সাহিত্য নিয়ে ডুবে থাকে।

এই মুহূর্তে তাকে দেখলে সেই কথাই মনে হত। ডেকচেয়ারে শুয়ে তন্ময় হয়ে গান শুনছিল বুঝি। ঘরের কোণে রেকর্ড প্লেয়ারে গান বাজছিল নিচু ভল্যুমে ! চোখ বন্ধ, মাথার নীচে একটা হাত আড়াআড়ি রাখা। পাশের টেবিলে চায়ের কাপ বোধ হয় জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। তার পাশে একগাদা টাইপ করা কাগজ, চিন্ময় মুস্তাফির আগামী বইয়ের ম্যানুসক্রিপ্ট আর লুজ নোটস। বোধ হয় একটু আগে পড়ছিল, এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখে যে-কেউ তাই ভাববে। কিন্তু ঘুমোয়নি, পুরোপুরি জেগেই আছে। তার সুশ্রী ভুরুজোড়া কেমন বিশ্রীভাবে কুঁচকে আছে। যেন ভুরুর মাঝখানে কিছু একটা কাঁটার মতো বিঁধে আছে। আসলে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা পাওয়ার পর থেকেই সে মুস্তাফির কেসটাকে অন্য লাইনে ভাবতে চেষ্টা করছে।

বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট বলছে, হৃৎপিণ্ডে তীর বিদ্ধ হওয়ার ফলেই চিন্ময়বাবুর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছিল। মৃত্যুর সময় আনুমানিক রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা। মৃতের পাকস্থলীতে পাওয়া গেছে মাদক। আরও স্পষ্ট করে বললে বিদেশী মাদক। অথচ যতদূর জানা যায় চিন্ময়বাবু মাদক গ্রহণ করতেন না, খেয়ালের বশে দু-চারটে সিগারেট খেতেন এই পর্যন্ত। সত্যি বলতে কি, কফি ছাড়া তাঁর কোনও নেশাই ছিল না। তাই কেমন খটকা লাগে। কাল রাতে হয়তো কোনও পার্টি ছিল কোথাও, বাটনহোলের গোলাপটা কি তারই ইন্ডিকেশন ? জীবনের কেমন মনে হচ্ছে হলিডে হোমের কেয়ারটেকার লোকটা দেখতে সাদাসিধে ভালমানুষ টাইপের হলেও ধূর্ত। সব সত্যি কথা বলছে না, চেপে যাচ্ছে।

রাধু চৌধুরীর কথা মনে পড়তেই ছেলে দুটির মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। কপালের ভাঁজ আর-একটু ঘন হল। একটা ছেলের নাম তার খুব পরিচিত মনে হয়েছিল কিন্তু তখন মনে পড়েনি। সুনন্দ বাগচী, হুঁ, এবার তার মনে পড়ল। হালে একটা গল্পের বইয়ে সে সুনন্দর কাহিনী পড়েছে। মনে পড়ল বেশ কিছুকাল আগে খবরের কাগজে 'কিশোর রহস্যভেদী' হেডিং দিয়ে একটা রোমাঞ্চকর খবর বেরিয়েছিল। খবরটায় কত পার্সেন্ট জল মেশানো ছিল তার জানা নেই, তবে সত্যি হলে সেটাও একটা রুদ্ধশ্বাস গল্পই বটে ! কিন্তু হলিডে হোমের এই ছেলেটা সেই সুনন্দ নাও হতে পারে। এক নামে

আপনার ত্বককে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বাছাই করা স্ট্রাইপড্ ১০০% সুতীর

অভিনব, নরম স্ট্রাইপড্ ১০০% সুতীর কাপড়

সূক্ষ্মতম সুতীতে বোনা—তাই যেমন নরম—পরেও তেমন আরাম। আপনার ত্বককে দেবে স্বাচ্ছন্দ্য—দেখতেও দারুণ।

পা ও কোমর ঘিরে ইলাসটিকের স্বাচ্ছন্দ্য

এই কাজকরা, নরম ইলাসটিক দেখতেও ভালো— পরতেও ভালো। পরে দেখুন, মাপও একেবারে ঠিকঠাক।

মেয়েদের গঠন অনুযায়ী সুন্দর, আধুনিক কাট

এই প্যান্টি আপনার শরীরের আকার নেবে। বেশী আঁটো বা বেশী ঢিলে হবে না। চলতে ফিরতে কত আরাম।

বেল মানেই ভালো জিনিষ, ঠিক দাম

বাছাই করা সেরা উপাদান, বিদেশী মেশিনে সেলাই করা—বেল্ পালোমা প্যান্টি যেমন আরামদায়ক তেমন টেকসই।

পালোমা স্ট্রাইপস—১৮/-
পালোমা রিবড—১৬/-
পালোমা ডোরি—১২·৫০

যে সব কমিশন এজেন্ট/রিটেলাররা আমাদের সেরা মানের জনপ্রিয় অন্তর্বাস বিক্রী করতে চান, তাঁদের আমরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। এ ছাড়াও কলকাতার বড়বাজারে পাইকারী হারে পাওয়া যায়।

Belle Wears Private Ltd
54B Suburban School Road
Calcutta 700 025
Phone : 48-3708

৪,০০,০০০ মহিলার প্রিয় বেল্—আপন করে নিন **belle**

'৮৮-র পূজা থেকে বেল্-এর 'ডোর-টু-ডোর' বিক্রী বন্ধ হয়ে গেছে।

HTA 3578 R2

কি আর দু-তিনজন থাকতে পারে না ? নিশ্চয়ই পারে। জীবন হায়দার নামেই তো আর-একজন আছে। বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় তার কবিতা ছাপা হয়।

ফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ। নীচে ভিজিটার এসেছে। বিরক্ত হল। অসময়ে লোকজন বড্ড বিরক্ত করে পুলিশকে। আর তারা কেউই সুখের খবর আনে না।

অফিস ঘরে ঢুকতে-ঢুকতেই সুনন্দ আর অমিয়কে দেখতে পেয়ে গেল জীবন। এক পাশের দেওয়ালে ঝোলানো টাউনের ফুলসাইজ ম্যাপটার সামনে দাঁড়িয়ে দু'জনে নিচু গলায় কিছু বলাবলি করছে। কিন্তু আসল ভিজিটার ওরা নয়। সাব ইন্সপেক্টর গড়াই উঠে দাঁড়িয়ে চোখের ইশারায় লোকটিকে দেখিয়ে দিল। জীবনের টেবিলের উলটো দিকের চেয়ারে সে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে ছিল।

"হ্যাঁ বলুন!" নিঃশব্দে নিজের চেয়ারে বসতে-বসতে জীবন বলল।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক সুবেশ যুবক হাত সরিয়ে মাথা তুলল। উসকোখুসকো চুল, চোখ দুটো লাল। বোধ হয় একটু আগেও কাঁদছিল। ধরা গলায় বলল, "আমি ডঃ মুস্তাফির নেফিউ।"

"মানে ভাইপো না বোনপো ?"

"ভাগনে। ওঁর কোনও ভাই নেই।"

"এত দেরি করলেন ?"

"জানতাম না। এখানে এসে খবরটা পেলাম।"

"কেন, কলকাতার থানা থেকে খবর দেয়নি ? আমি তো সঙ্গে-সঙ্গেই খবর পাঠিয়েছি!"

"ঠিক বলতে পারব না। আমি তখন কলকাতায় ছিলাম না। কোন্নগরে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সরি, আমার নামটাই বলা হয়নি। রতন নিয়োগী। লন্ডনে থাকি। রিসেন্টলি দেশে ফিরেছি। এমন একটা ঘটনা ঘটে যাবে স্বপ্নেও ভাবিনি।"

জীবন বলল, "আ'য়াম ভেরি সরি মিঃ নিয়োগী। আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। এরকম অপ্রত্যাশিত আঘাত। হ্যাঁ, সবই তো শুনেছেন!"

রতন মাথা কাত করে জানাল শুনেছে। তারপর ভাঙা গলায় বলল, "আমি মামার শেষ কাজ করতে চাই, ডেডবডির জন্য এসেছিলাম।"

জীবন এতক্ষণ এক দৃষ্টিতে রতনকে দেখছিল, এবার মুখ ফিরিয়ে সুনন্দদের দিকে তাকাল। বলল, "তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন, এখানে এসে বোসো। তোমরাই বোধ হয় এঁকে নিয়ে এসেছ, কেন চৌধুরীমশাই এলেন না ?"

সুনন্দ বলল, "আসতেন কিন্তু আমাদের নিজেদেরও একটু দরকার আছে তাই..."

জীবনের ঠোঁটের কোণে খুব আবছা হাসি ফুটে উঠেছিল, সেটা ঢাকতে ও সিগারেট ধরাল। তারপর প্যাকেটটা রতন নিয়োগীর দিকে বাড়িয়ে ধরতে সে মাথা নাড়ল, "আমি স্মোক করি না। সার, মামার ডেডবডিটা..."

"আপনাকে তো হাসপাতালের মর্গে যেতে হবে।"

"গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি লিখে না দিলে তো রিলিজ হবে না।"

"আপনার কপাল ভাল আজ এসে গেছেন। আর একদিন দেরি হলে বডি চালান হয়ে যেত। আনক্লেইমড বডি তো বেশিদিন ধরে রাখা যায় না।" ড্রয়ার থেকে কাগজ খুঁজে নিয়ে চিরকুট লিখতে শুরু করেছিল। হঠাৎ মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করল, "কোন্নগর থেকেই বুঝি এখানে আসছেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কিন্তু এখানকার ঠিকানা কোথায় পেলেন ? উনি যে এখানে আছেন সেটা তো আপনার জানবার কথা নয়!" চোখ তুলে তাকাল জীবন।

"মামাই লিখে জানিয়েছিলেন, এই সময়টা উনি এখানে থাকবেন।"

"তাঁর চিঠিতে আর কিছু ছিল ?"

জীবনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে রতন বার-দুই ইতস্তত করে বলল, "ছিল। লিখেছিলেন বিশেষ কারণে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হওয়া দরকার। দেরি করলে আপসোসের কারণ ঘটতে পারে।"

"কথাটার মানে কিছু বুঝেছিলেন ?"

"একটু চুপ করে থেকে রতন বলল, "ভেবেছিলাম উইল-টুইলের ব্যাপার কিছু হবে।"

"উইল ? আপনার মামার বয়স কত হবে ? স্বাস্থ্য তো খুব ভালই ছিল, কী বলেন ?"

"তা ছিল, গায়েও খুব শক্তি ছিল। পাঞ্জা লড়তে গিয়ে এক পালোয়ানের কব্জি মচকে দিয়েছিলেন গল্প শুনেছি। বয়স কত আর হবে, পঞ্চাশ-একান্ন বোধ হয়।"

"তা হলে ? এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন কেন ? কোনও বিপদের আশঙ্কা করছিলেন কি তা হলে ?"

"বলতে পারব না। তবে অনেক বুনো উপজাতির মধ্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়েই তো কাজ করতে হত। সবাই কি আর কো-অপারেটিভ হয়, সভ্য সমাজের মানুষকে ভালভাবে নেয় ?"

"আচ্ছা কোনও শত্রু ছিল আপনার মামার ? শুনেছেন তেমন কারও কথা ?"

মেদ্‌নিপুরের গাঁয়ে

শ্যামলকান্তি দাশ

ছবির মতো জল টলটল
এইটুকুনি নদী
ফিন্‌-ফোটা এক জ্যোস্‌নারাতে
গান হয়ে যায় যদি !

গান যদি হয় ঘরভোলানো
আকাশ যদি ডাকে,
ঘাসফুলেদের চোখ ফুটে যায়
পথের বাঁকে বাঁকে ।

শালুকপাতায় রাত্রি কাঁপে
পদ্মপাতায় তারা,
সাদা বাড়ির বারান্দাতে
দাঁড়িয়ে আছে কারা !

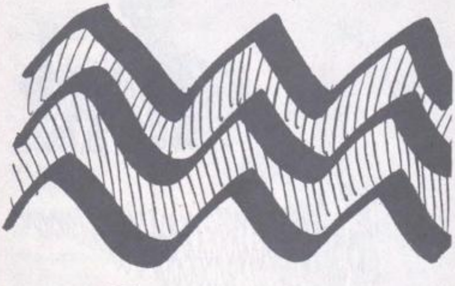

ধুধু মাঠের ঝুপসিগাছে
দুলছে কালো পাখি,
এখনও তার একটি-দুটি
স্বপ্ন দেখা বাকি ।

ঘুম টুটে যায় খেয়ামাঝির
নৌকো চলে ভেসে,
সবচেনাদের হাট পেরিয়ে
অচিন নিরুদ্দেশে ।

সাঁকোর উপর দুলছে ছায়া
ডাইনে এবং বাঁয়ে,
চাঁদের খোঁজে মেঘ চলেছে
মেদ্‌নিপুরের গাঁয়ে ।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

"শুনিনি । তবে থাকা আশ্চর্যের কিছু না । প্রফেশনাল জেলাসি তো পণ্ডিতদের মধ্যেও থাকে । অমন আন্তর্জাতিক খ্যাতি ক'টা বাঙালি পেয়েছে । সম্প্রতি নাকি এমন কাজে হাত দিয়েছিলেন যে বেঁচে থাকলে হয়তো একদিন নোবেল পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারতেন ।"

"তা ছাড়া আপনার মামা ধনী ছিলেন বলেও শুনেছি । আপনি ছাড়া আর কোনও উত্তরাধিকারী ?"

"আমার এক মাসতুতো দাদা ছিলেন । কয়েক বছর হল তিনি নিরুদ্দেশ । সবারই ধারণা তিনি মারা গেছেন ।"

"আপনার পড়াশোনা বোধ হয় বিলেতেই ?"

"না । কলকাতার সেন্ট পলস-এ বি·এ· পড়েছি । মামাই আমাকে বিলেতে পাঠান । কিন্তু পড়াশোনায় আর আমার মন বসল না । ওখানেই ব্যবসায় মেতে গেলাম ।"

"কিসের ব্যবসা ? বিদেশে বাঙালি ব্যবসা করছে শুনলে আনন্দ হয় ।"

"কিউরিও শপ বলতে পারেন । দেশ-বিদেশের নানান যুগের খেলনাপাতি আমদানি করি । শখ-আমোদের জিনিসও রাখি ।"

জীবন আর কিছু জিজ্ঞেস করল না । চিরকুট লিখে থানা থেকেই গাড়ির ব্যবস্থা করে দিল । কিন্তু সুনন্দদের তক্ষুনি ছাড়ল না । ওপরে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে গেল । বলল, "আজ তোমাদের আমার এখানেই নেমন্তন্ন । পুলিশের রান্না একদিন চেখে দেখে যাও ।"

জীবন হায়দার এমনই আড্ডাবাজ, আমুদে আর মজার মানুষ যে, আধ ঘন্টার মধ্যেই সুনন্দরা ভুলে গেল তারা থানার কোয়ার্টারে রয়েছে । ভুলে গেল লোকটা পুলিশের ডাকসাইটে ও· সি· । এমনকী বয়সের যে কোনও ফারাক আছে সেটাও আর মনে থাকল না । খেয়ালই করল না নিজেদের অজান্তেই কখন হায়দারকে জীবনদা বলে ডাকতে শুরু করেছে, যেন কোন্ ছেলেবেলার চেনা ।

এই দ্বিতীয় দিনের দর্শনেই সুনন্দর মনে হয়েছিল জীবন হায়দার মানুষটার সিকিভাগ যদি পুলিশ হয় তা হলে বারো-আনাই অন্য কিছু । ঠিক কমলেশকাকুর মতো । তিনি যে লালবাজারের ডি·সি·ডি·ডি·এবং বয়সে প্রায় বাবার বয়সী এবং বন্ধু সেকথা মনেই থাকে না । একেবারেই মাইডিয়ার ফ্রেন্ড হয়ে যান দেখা হলেই । ছোটদের কখনওই ছোট ভাবেন না, উলটে পরামর্শ চান, বুদ্ধি জোগাতে বলেন । সুনন্দ ধরেই নিয়েছিল জীবন হায়দারকে বিশ্বাস করে মন-প্রাণ খুলে সব বলা যায় । ব্রেকফাস্ট শেষ হলে সুনন্দর দিকে তাকিয়ে জীবন বলল, "সুনন্দ, তুমি যেন কী বলবে বলে আমার কাছে এসেছিলে ?"

সুনন্দ পকেট থেকে একটা সাদা খাম বের করে জীবনের হাতে দিল । জীবন অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার, কী আছে এর মধ্যে ?"

"কয়েকটি মরা পোকা । দেখুন তো চিনতে পারেন কি না । আমরা কখনও এই ধরনের পোকা দেখিনি । কেয়ারটেকার রাধু চৌধুরীকে দেখালাম, তিনিও চিনতে পারলেন না । বললেন, কোনও বিষাক্ত বুনো পোকা হতে পারে । তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে বললেন । কিন্তু আমরা ফেলিনি ।"

জীবন বলল, "তা বিষাক্ত যখন ফেলে দিলেই পারতে । আমার কাছে নিয়ে এসেছ কেন ? জাস্ট কৌতূহল ? তোমরা কি বায়োলজির ছাত্র ?"

খামের মুখটা ফাঁক করে ভেতরে উঁকি মেরে পোকাগুলো একনজর দেখে নিল জীবন । তারপর হো-হো করে হেসে উঠে বলল,

"আজ পয়লা এপ্রিল নাকি, যে আমাকে বোকা বানাতে এসেছ ?"

সুনন্দ অবাক, "সিরিয়াসলি বলছি জীবনদা, আমরা আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না !"

করছ না বললেই বিশ্বাস করব ? আরে এ তো তোমরা হাজারে-হাজারে দেখেছ, অচেনা হবে কোন দুঃখে ? গাঁয়ের একটা শিশুকে জিজ্ঞেস করলেও বলে দেবে। এগুলো ধরলে কোথা থেকে ? নাকি মরা অবস্থায় পেয়েছ ?"

কীভাবে মুস্তাফির পকেট থেকে পোকাগুলোকে পেয়েছিল, আজ বলতে কোনও সঙ্কোচই হল না। একটা ছাইদানের মধ্যে চাপা দিয়ে রেখে ভুলেই গিয়েছিল এগুলোর কথা। পরে কাল যখন মনে পড়ল তখন দ্যাখে সব ক'টাই মরে গেছে।

"ওহে খুদে ডিটেকটিভ, তোমরা পুলিশের ওপরেও বাটপাড়ি করেছ ? ওয়ান্ডারফুল ! আমাদের নিশ্চয় চোখেই পড়ত না। সত্যি তোমার দেখার চোখ আছে ! আবার অন্ধও বটে !"

সুনন্দর মুখ ম্লান হয়ে গেল, "কেন, অন্ধ কেন বলছেন ?"

"জোনাকি যে দেখতে পায় না সে অন্ধ ছাড়া কী ? এগুলো জোনাকি, চিনতে পারলে না ? কলকাতায় তো বিস্তর জোনাকি দেখতে পাওয়া যায়।"

সুনন্দ কী ভাবল কয়েক সেকেন্ড। পরে বলল, "ছেলেমানুষি না, জীবনদা। বেশ ভেবেচিন্তে, অনেক আগে থেকে ভেবেচিন্তেই কাজটা করা হয়েছিল। এজন্য তাকে নিশ্চয়ই জোকাকিগুলো সংগ্রহ করে রাখতে হয়েছিল।"

জীবন হাসল, "তোমার গল্পটা খুবই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে নাকি ভাই। একটা স্ট্রং রিজন্ চাই। কারণ ছাড়া কি কোনও কাজ হয় ?"

"কারণটা তো আমার কাছে খুব স্পষ্ট বলেই মনে হচ্ছে। হার্টের জায়গাটাকে টার্গেট বানানো। অমাবস্যার রাত্তিরে দূর থেকেই যাতে লক্ষ্যভেদ করা যায়। সে তীর ছুঁড়েছিল, এটা তার সুবিধের জন্যই করা হয়েছিল।"

জীবন শুধু 'মাইগুডনেস' বলে চুপ করে গেল। সে বোধ হয় দ্রুতগতিতে দৃশ্যটা ভাববার চেষ্টা করছিল। সুনন্দ ধীর গলায় তাদের চালঘর অভিযানের কথা বলল। তাদের ওপর যে মারাত্মক আক্রমণ হয়েছিল সে-কথাও সবিস্তারে বলল। মুগ্ধ বিস্ময়ে জীবন সুনন্দর কথা শুনছিল। এবার মাথা নেড়ে বলল, "বাহবা পাওয়ার যোগ্য হলেও কাজটা তোমাদের ঠিক হয়নি। কপালের জোরেই এ-যাত্রা বেঁচে গেছ। মনে রেখো, শত্রু একজন এমন খুনি, মানুষ মারতে তার হাত কাঁপে না। সামান্য কারণেই সে আরও খুন করতে দ্বিধা করবে না।

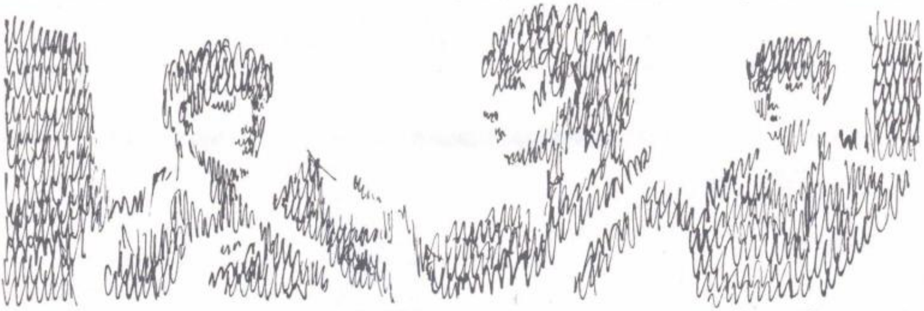

কয়েক মুহূর্তের জন্য সুনন্দ বোবা হয়ে গেল বিস্ময়ে এবং লজ্জায়। সে-ভাবটা কেটে যাবার পর কী বলতে গিয়ে দ্যাখে জীবন হায়দার হঠাৎ খুব গম্ভীর আর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। আপন মনেই বিড়বিড় করে বলে চলেছেন, "বাট হোয়াই জোনাকি ? অ্যান্ড হোয়াই ইন হিজ পকেট ! উনি কি শেষমেশ জোনাকি নিয়েও গবেষণা করছিলেন নাকি ? আশ্চর্য না ? আদিম সমাজের সঙ্গে, মানব সভ্যতার সঙ্গে জোনাকির সম্পর্ক নিয়ে হতেই পারে রিসার্চের কাজ। আশ্চর্য কিছুই নয়।"

সম্বিৎ ফিরে আসতে জীবন দেখল সুনন্দ ক্লাসে অতি উৎসাহী পড়া-বলিয়েদের মতোই একটা হাত তুলে বসে আছে। হেসে ফেলে বলল, "বলো।"

"জীবনদা, আমার হঠাৎ একটা কথা মনে হল। জামার বুক পকেটে আপনাথেকেই জোনাকি ঢুকে যাওয়া সম্ভব নয়। তার ওপর একগাদা জোনাকি। তাই এটাই স্বাভাবিক যে, হয় উনি নিজে, নয়তো অন্য কেউ ওঁর পকেটে ওগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমার বিশ্বাস অন্য কেউই হবে।"

"বাট হোয়াট ফর ? এই ছেলেমানুষি কাণ্ড সে কেন করবে ! নেশার ঝোঁকে ? মুস্তাফির ভিসেরা-টেস্টে ধরা পড়েছে ওঁর স্টমাকে মাদক ছিল।"

এবং তোমাদের ওপর তার নজর আছে। সুনন্দ, অমিয়, খুব সাবধান হয়ে এখন থেকে চলাফেরা করবে। আর ভুলেও ওদিকে যাবে না। এখন মনে হচ্ছে জোনাকির ব্যাপারটা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এই শহরেই কোনও বাড়িতে একটা ছোটখাটো পার্টি হয়েছিল। সেখানে মুস্তাফির অন্যমনস্কতার সুযোগে বাটনহোলে গোলাপ গুঁজে দেওয়ার ছুতো করে পকেটে জোনাকি ঢুকিয়ে দেওয়া কঠিন কিছু না।"

সুনন্দ বলল, "ঠিক বলেছেন, আমি এতটা ভাবতে পারিনি। কিন্তু জীবনদা, মিঃ মুস্তাফিকে কেন খুন করা হয়েছে, সেটা কিছু অনুমান করতে পারলেন ?"

"মোটিভটাই ধরতে পারছি না। হয়তো একাধিক মোটিভ জট পাকিয়ে আছে এই মার্ডারের পিছনে। তোমাকে বলতে আমার কোনও বাধা নেই। সম্পত্তি হতে পারে, জেলাসি হতে পারে, এমনকী আরও একটা কারণ থাকতে পারে..." জীবনকে বেশ চিন্তিত দেখাল। সুনন্দ ওর চিন্তায় বাধা না দিয়ে চুপ করে থাকল। একটু পরে জীবন নিজেই আবার কথা বলল, "মুস্তাফির বইয়ের পাণ্ডুলিপির কয়েকটা পাতা মিসিং, বোধ হয় কেউ সরিয়ে ফেলেছে। কী ছিল তার মধ্যে জানি না, তবে ওঁর পুরনো রাফ-নোটের মধ্যে একটা দারুণ খবর আছে। লিখেছেন কোনও দুর্গম গুহায় এক প্রাগৈতিহাসিক মূর্তির

সন্ধান পেয়েছেন। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ওই মূর্তিটা এক প্রাচীন আরণ্যক জাতির দেবতা। এই লুপ্তপ্রায় জাতির একটি শাখা এখনও সভ্যসমাজের চোখের আড়ালে বসবাস করে। হিংস্র নিষ্ঠুর এই উপজাতির কুলদেবতা এই মূর্তিটিকে দূর থেকে দেখেছেন মুস্তাফি। কাছে যাবার সুযোগ এখনও হয়নি। এক পূজা অনুষ্ঠানের সময় যখন গুহা থেকে মূর্তিটিকে বের করে ঝরনার জলে স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন এক গাছের মাথায় লুকিয়ে মুস্তাফি দেখে ফেলেছিলেন। দূরবিনের সাহায্যে যা দেখেছেন তাতেই বিস্মিত হয়েছেন মুস্তাফি। মূর্তিটাকে তেমনভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ পেলে হয়তো মানব সভ্যতার আর-এক অজানা ইতিহাস উদ্ঘাটিত হবে। মূর্তিটি খুব সম্ভব সূর্যমূর্তি। সৌরজগতের জ্যামিতি খোদাই করা এই প্রতীক-মূর্তিটা কি এই গ্রহের মানুষের সৃষ্টি, নাকি ভিনগ্রহের মানুষ কখনও এই অঞ্চলে মূর্তিটা স্থাপন করে গেছে? এত কথা কিন্তু মুস্তাফি তাঁর নোটে লিখে যাননি। আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যাপারটা লিখে রেখেছেন। আমাকে বিস্তর মাথা ঘামিয়ে বুঝে নিতে হয়েছে। আমি···"

কথার মাঝখানেই হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। একটু আগে জীবন একটা ডিসট্যান্ট কল বুক করেছিল, বোধ হয় লাইনটা পাওয়া গেছে। জীবন দৌড়ে পাশের ঘরে চলে গেল। অমিয় নিচু গলায় বলল, "তবে কি এই মার্ডারটা সেই উপজাতির প্রতিহিংসা।"

"মিক্সড় মোটিভও হতে পারে। হয়তো একাধিক লোকের স্বার্থ এর পেছনে কাজ করেছে।" সুনন্দ বেশ ভারিক্কি চালে বলল, "যে-কোনও কারণে কেউ ওদের খেপিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করেছে। মুস্তাফির মৃত্যু উপজাতির কোনও লোকের হাতে ঘটলেও হয়তো দেখা যাবে সেই হাতের পিছনে সভ্যসমাজের কোনও মস্তিষ্কই কাজ করছে।"

ঘরে ঢুকেই সুনন্দ কীরকম আড়ষ্ট হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অমিয় অবাক হয়ে বলল, "কী হল? তুই অমন করছিস কেন?"

"আমার কেমন মনে হচ্ছে, এ-ঘরে কোনও লোক ঢুকেছিল। দাঁড়া, দেখি।"

অমিয় হাসল, "লোক তো ঢুকেছিলই, এটা আবার কি নতুন কথা হল। আমরা সকালে বেরিয়ে যাওয়ার পর কাজের লোক ঘর পরিষ্কার করতে ঢুকেছিল। আমি তো ঘরে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি।"

সুনন্দ কোনও উত্তর দিল না। ওয়ার্ডরোব খুলে সুটকেস আর ব্যাগ বের করল। সেগুলোর ভেতরে একনজর তাকিয়েই বলল, "ইয়েস, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভুল করেনি। যে ঢুকেছিল সে সামান্য চোর নয়, টাকাপয়সায় হাত দেয়নি। কিন্তু আমাদের জামাকাপড় হাতড়েছে। সে বোধ হয় অন্য কিছু খুঁজতে এসেছিল। তুই ঘরেই থাক, আমি রাধু চৌধুরীর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।"

কিন্তু রাধু চৌধুরীকে পাওয়া গেল না। কাজের লোক জানাল, উনি কিছুক্ষণ আগে বেরিয়েছেন। শ্মশানে গেছেন, ফিরতে রাত হবে। বুঝল মুস্তাফির সৎকারের ব্যাপারে রতন নিয়োগী ওঁকেও সঙ্গে নিয়েছে। থমথমে মুখে ঘরে ফিরে আসতেই অমিয় শুধোল, "চৌধুরীর সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছিস নিশ্চয়!"

আকাশে ওড়ার কথা □ চব্বিশ — ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৬-১৭ : ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান

ব্রিস্টল ফাইটার

ব্রিসহিট নামে সমধিক প্রসিদ্ধ এই যুদ্ধবিমানটি প্রথম দিকে মোটেই সুবিধে করতে পারেনি। জার্মানির বিখ্যাত ফাইটার-পাইলট 'দি রেড ব্যারন' ব্যারন ফন রিক্‌তোফেন প্রথম দিনেই চারটি ব্রিস্টল বিমানকে ভূপাতিত করেন। এর পর অবশ্য বিমানটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা হয়, যার জন্য বিমানটি যুদ্ধে বিশেষ সাফল্য লাভ করে ও বিপক্ষের বৈমানিকেরা একে সমীহ করে চলেন।

ডি এইচ-৪

এই বোমারু বিমানটি গতিবেগে সহজেই বিপক্ষের ফাইটার বিমানকে পরাস্ত করতে পারত। এর দোষ ছিল দুটি ককপিটের মধ্যে ব্যবধান, যার জন্য বৈমানিক ও নিরীক্ষণকারীর মধ্যে যোগাযোগ দুরূহ হত। তা সত্ত্বেও ডি এইচ-৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ডে বম্বার। তৈরি হয়েছিল মোট ১৪৪৯টি।

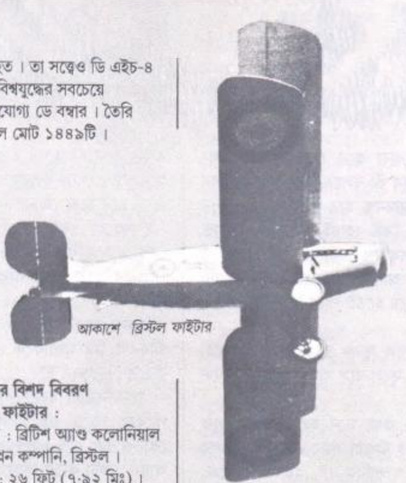

আকাশে ব্রিস্টল ফাইটার

বিমানের বিশদ বিবরণ

ব্রিস্টল ফাইটার :
নির্মাতা : ব্রিটিশ অ্যাণ্ড কলোনিয়াল এরোপ্লেন কম্পানি, ব্রিস্টল।
লম্বায় : ২৬ ফিট (৭·৯২ মিঃ)।
ডানার আয়তন : ৩৯·২৫ ফিট (১২ মিঃ)।
যাত্রী : একজন বৈমানিক ও একজন নিরীক্ষণকারী।
অস্ত্রসম্ভার : একটি স্থিরলক্ষ্য মেশিনগান যা সামনের দিকে গুলি ছুঁড়তে সক্ষম।
পিছনের ককপিটে নিয়ন্ত্রণযোগ্য একটি বা দুটি মেশিনগান।
গতিবেগ : ঘণ্টায় ১২৩ মাইল (২০০ কিমি)।
সিলিং : ২১,৫০০ ফিট (৬৫০০ মিঃ)।
একটানা ওড়ার ক্ষমতা : ৩ ঘণ্টা।
এঞ্জিন : একটি ২৭৫ অশ্বশক্তির রোলস রয়েস ফ্যালকন-৩।

ডি এইচ-৪ :
নির্মাতা : এয়ারক্রাফ্‌ট ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পানি, হেণ্ডন।
লম্বায় : ৩০·৭ ফিট (৯·২৩ মিঃ)।
ডানার আয়তন : ৪২·৩ ফিট (১২·৯ মিঃ)।
যাত্রী : একজন বৈমানিক ও একজন নিরীক্ষণকারী।
অস্ত্রসম্ভার : কেবল সামনের দিকে গুলি ছুঁড়তে সক্ষম এমন একটি মেশিনগান।
পিছনের ককপিটে একটি বা দুটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য মেশিনগান।
মোট ৪৬০ পাউণ্ড বোমা।
সর্বাধিক গতিবেগ : ঘণ্টায় ১১৯ মাইল (১৯০ কিমি)।
সিলিং : ১৬,০০০ ফিট (৪৯০০ মিঃ)।
এঞ্জিন : একটি ২৫০ অশ্বশক্তির রোলস রয়েস ঈগল-৩।

"না। উনি নেই।" বলেই খাটের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল।

অমিয় হেসে বলল, "দুর পাগলা, একটা লোক যদি আমাদের জিনিসপত্তর হাতড়েই থাকে তাতে এত মুষড়ে পড়ার কী আছে। টাকাকড়ি তো আর খোয়া যায়নি। আমার মানিব্যাগও ইনট্যাক্ট আছে, গুনে দেখলাম।"

সুনন্দ ঝাঁ করে উঠে বসল, "বোকার মতো কথা বলিস না। একটা উটকো লোক হলিডে হোমে ঢুকে দিনের আলোয় অপরের ঘরের তালা খুলবে, ধীরেসুস্থে বাক্স-প্যাঁটরা হাতড়ে ইনভিসিবল ম্যানের মতো বেরিয়ে যাবে, এও কখনও হয়! ব্যাপারটা কতখানি সিরিয়াস বুঝতে পারছিস না!"

"কিন্তু তোর তো ভুলও হতে পারে? কেউ যে ঢুকেই ছিল এমনই বা ভাবছিস কেন? আর আমাদের কাছে অন্য কিছু বা কী থাকতে পারে যে..."

"না! আমার ভুল হয়নি। যে এসেছিল সে খুবই সাবধানী, জিনিসপত্র একটুও অগোছাল করেনি, যেমনকার তেমনই রেখে গেছে। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই আমার এমন খুঁতখুঁতে স্বভাব যে, আমার কোনও জিনিস একচুল নড়লে আমি টের পেয়ে যাই। ওয়ার্ডরোবের তালাটা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম প্রথমে। তুই খেয়াল করিসনি হয়তো তালাটা আমি উলটো করে লাগাই, মানে চাবির দিকটা পেছন করা থাকে। এটা আমার অতি-সতর্কতার বাতিক বলতে পারিস। লোকটা ওখানেই ভুল করেছিল। কিন্তু ভুল করলেও, শুধু হাতে সে ফেরেনি, যা খুঁজতে এসেছিল নিয়ে গেছে।"

বিস্ময়ে অমিয়র মুখ দিয়ে একটা কিম্ভূত শব্দ বেরোল। হাঁ করে সুনন্দর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, "কী সেটা?"

"আমি একটা গণ্ডমূর্খ, বুঝেছিস! সুনন্দ আফসোসের গলায় বলল, "নিজের গালে নিজেরই চড় মারতে ইচ্ছে করছে। কাল থেকে কেবলই একটার পর একটা ভুল করে চলেছি। জীবনদা ঠিকই বলেছেন, আমি অন্ধ। অনেক ছোট-ছোট জিনিস আমি কেবলই ভুলে যাচ্ছি এখানে এসে ইস্তক। সত্যি, আমি জীবনে গোয়েন্দা হতে পারব না।"

"নাও ঠেলা! মেন লাইন থেকে তুই কর্ড লাইনে চলে গেলি যে! জিনিসটা কী খোয়া গেছে সেটা বলবি তো! লোককে পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখিস কেন?"

সুনন্দ উঠে গিয়ে ভেতরের বারান্দায় আগে উঁকি মারল তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে অমিয়র পাশে এসে বসল। অমিয় কৌতূহলী গলায় বলল, "কেউ আড়ি পেতে আছে কিনা দেখলি তো?"

সুনন্দ সে-কথার জবাব না দিয়ে বলল, "তোর মনে আছে নিশ্চয়ই, জীবনদার সঙ্গে আমরা সেদিন ডঃ মুস্তাফির ঘরে ঢুকেছিলাম।"

"হ্যাঁ, তুই এক সময় ওঁর টেবিলের ওপাশে গিয়ে নিচু হয়ে কী যেন দেখছিলি। জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম কিন্তু পরে আর মনে পড়েনি।"

"ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা দেখছিলাম। কমলেশকাকু প্রায়ই একটা কথা বলতেন, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন। ডাস্টবিন আর ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট থেকে একটা মানুষের কিংবা একটা পাড়ার বাসিন্দাদের অবস্থা টের পাওয়া যায়।"

"মুস্তাফির বাস্কেটে কিছু দেখতে পেয়েছিলি?"

"পেয়েছিলাম। অমূল্য রতনই পেয়েছিলাম হয়তো। ড্যালা পাকানো কাগজের মোড়কটা কী খেয়ালে সকলের নজর এড়িয়ে তুলে

এনেছিলাম। পরে খুলে দেখি গোল করে পাকানো ফিল্ম নেগেটিভ। কাজের নয় বলে হয়তো মুস্তাফি ফেলে দিয়েছেন। একটা কিম্ভূত আকারের মূর্তির গোটা দশেক কপি আর বন পাহাড় এবং আদিবাসী মানুষের ছবি বলে মনে হয়েছিল। কাগজটাতেও হিজিবিজি আঁচড় কেটে কীসব লেখা। কোনও কম্মেই লাগবে না ভেবে বাথরুমের জানলা দিয়ে ফেলে দিতেই গিয়েছিলাম কিন্তু কী ভেবে ফেলিনি, সুটকেসের ভেতরে রেখে দিয়েছিলাম। সেটাই হাপিস হয়ে গেছে।"

"তাই বল। আমি ভেবেছিলাম না জানি অমূল্য সম্পদ।"

"জীবনদার মুখে মুস্তাফির নতুন আবিষ্কারের কথা শুনে এসে হঠাৎ মনে হল এটাই সেই আদিবাসী বিগ্রহের ছবি। টেলিলেন্সের সাহায্যে হয়তো মুস্তাফি ফোটো তুলেছিলেন। তবে অকাজের ভেবে ফেলে দেননি, খুব সাবধানী বলেই হয়তো ওভাবে ফেলে রেখেছিলেন। মুস্তাফি নিশ্চয় জানতেন তাঁর ঘরের নিরাপত্তা নেই, তিনি বাইরে বেরোলেই লোক ঢুকতে পারে। হয়তো পাণ্ডুলিপির খানিকটা অংশ খোয়া যেতেই তাঁর চোখ খুলে গিয়েছিল।"

"ওরে বাবা! আমরা তা হলে কোথায় আছি রে সুনন্দ?"

"এই কথাই আমি তোকে বলতে চাই। রাধু চৌধুরী লোকটাকে কিন্তু আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না। আর সেই কথাটাই বলব বলে জীবনদার কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু গল্পে-গল্পে ঠিক ভুলে মেরে দিলাম। আচ্ছা, রাধুবাবুর কোনও নেশা আছে লক্ষ করেছিস? বিড়ি-সিগারেট পান-জর্দা বা এই জাতীয় কিছু?"

অনেক ভেবে অমিয় বলল, "না, তেমন কোনও নেশা বোধ হয় নেই। তবে হ্যাঁ, ওঁকে আমি কয়েকবার পানের মসলার প্যাকেট খুলে মুখে ঢালতে দেখেছি। আজকাল তো ওইসবের খুব চল হয়েছে। কিন্তু একথা কেন?"

সুনন্দ রহস্যের হাসি হেসে বলল, "পরশু সেই চালাঘরের মেঝে থেকে আমি একটা পানের মসলার আধখালি প্যাকেট কুড়িয়ে পেয়েছি।"

আবছা ঘুমের মধ্যেই হাতে আর পায়ে অসাড় হয়ে আসা যন্ত্রণা টের পাচ্ছিল সুনন্দ। তারপর ঘুমটা হঠাৎ পুরোপুরি ভেঙে যেতেই চোখ খুলে অবাক হয়ে গেল। তার হাত দুটো পেটের ওপর জড়ো করে নাইলনের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। টের পেল পা দুটোও বাঁধা রয়েছে। শক্ত পাথুরে মাটির ওপর সে শুয়ে আছে। সদ্য ঢালাই করা এক ছাদের নীচে, বোধ হয় নতুন তৈরি হচ্ছে এমন কোনও বাড়ির ভেতর। ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝতে পারল না। যতদূর মনে পড়ছে

কাল রাতে সকাল-সকালই শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু হলিডে হোমের সেই বিছানা থেকে এই অচেনা অদ্ভুত জায়গায় সে কী করে এল? ঘাড় ফেরাতেই অমিয়কে দেখতে পেল, একটু তফাতে সেও একই অবস্থায় পড়ে আছে। ডাকতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোল না। বুঝতে পারল চওড়া সেলোটেপ দিয়ে ঠোঁট দুটো সাঁটা।

মাথার দিক থেকে খুব পরিচিত একটা গলা শোনা গেল, "আরে বাবা, সিগারেটটা পরে খেলে হত না, ঘুমের ওষুধের ঘোর কাটার আগেই নেংটি দুটোকে পুঁতে ফেলা দরকার। সকাল হয়ে গেছে, আমাকে আবার থানায় যেতে হবে ডাইরি লেখাতে!"

গলাটা চিনতে পেরেও নিজের কানকে বিশ্বাস হল না, চোখ উলটে তাকাতেই রাধু চৌধুরীকে দেখতে পেয়ে গেল সুনন্দ। সে এক মনে পানের মসলার প্যাকেট ছিঁড়তে ব্যস্ত।

খলখল করে হেসে উঠল অন্য লোকটা, একটু তফাতে ঘুরে বসে সিগারেট টানছিল, জবাব দিল, "এত তাড়া কিসের! জ্ঞানে-অজ্ঞানে থোড়াই ফারাক, জ্যান্ত বোবা তো আর টুঁ শব্দটুকুও করতে যাচ্ছে না। এখন শুধু গর্তে নামিয়ে মাটি চাপা দেওয়ার ওয়াস্তা। তারপর বড় জোর দেড় থেকে দু' মিনিটে সব শেষ। তুমি যখন থানা থেকে বেরোবে ততক্ষণে আমার মিস্ত্রিরা সেফটি ট্যাঙ্কের বেস ঢালাই করে ফেলেছে জানবে। একেবারে পাকাপোক্ত কবর, এই জন্মের মতো। কীরকম প্ল্যানটা বাতলেছিলুম বলো? একটা থ্যাঙ্ক দাও!"

"অ্যাই শাবাশ! গিরগিটির বাচ্চাটার চোখ ফুটেছে দেখছি!"

"কোন বদমাশটা দেখি!" অন্য লোকটা সামনে এসে কোমরে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল, তার ঠোঁটে ঝুলন্ত সিগারেটের সঙ্গে এক চিলতে নিষ্ঠুর হাসি, "ওঃ, সেই ডি· সি· কমলেশের চ্যালা আর হায়দার ও· সি·-র চামচে! বহুত পাকা, বহুত বিচ্ছু! আমাদের পিছনে এসে ইস্তক লেগেছিস! দেখি এবার কী করে বাঁচিস?"

সুনন্দ তাজ্জব হয়ে দেখল লোকটা ডঃ মুস্তাফির ভাগনে রতন নিয়োগী। কিন্তু ভাববার আর সময় পেল না। ওরা দু'জনে সুনন্দকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিল চোখের পলকে। সুনন্দ হাত-পা ছোঁড়ার চেষ্টা করল, শুঁয়োপোকার মতো মিথ্যেই মোচড় খেল, কোনও লাভ হল না। ওরা ওকে বাড়ির বাইরে গভীর গর্তটার কিনারে বয়ে নিয়ে এল। বাড়ির কথা, মা-বাবা আর বোনটির কথা পলকের জন্য, শেষবারের জন্য মনে পড়ে গেল। বুকের ভেতরে মুচড়ে উঠল। দু' চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল তার। জীবনটা তো পড়েই ছিল, তবু এত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে···। আচমকা হুড়মুড় করে আকাশ ভেঙে পড়ল যেন। তিনজনে জড়ামড়ি করে মাটিতে, গুলির শব্দটা কান এড়িয়ে গেলেও তার প্রতিধ্বনি আর-একটা বজ্রহুঙ্কার কানে এল, "অ্যারেস্ট দেম।"

এই নাটকীয় ধাক্কাটা সামলে নিতে সময় লাগল সুনন্দর। কয়েকজোড়া ভারী বুট ছুটে এল ঝড়ের গতিতে। হাতকড়া আঁটার শব্দ হল। অস্ফুট গোঙানি তুলে কাতরাচ্ছিল মাটিতে পড়ে। জীবনদা ওর মুখের টেপ আর হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে তুলে দাঁড় করিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "কিস্যু হয়নি, ওঠ!"

"জীবনদা তুমি!" বলেই সুনন্দ আর নিজেকে সামলাতে পারল না, শব্দ করে কেঁদে ফেলল হাউহাউ করে।

জীবন ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, "দূর বোকা, কাঁদছিস কেন! আমি তো তোদের ওপরে গোপনে পাহারা বসিয়েছিলাম। শুধু হাতেনাতে ওদের ধরব বলেই এতটা দেরি করেছি। নইলে···। এই স্মাগলারের গ্যাংটাকে অনেক দিন থেকেই খুঁজছিলাম। রতনের জুতো-জোড়াই ওর কাল হল। থানায় এসে ও যতই গপ্পো ফাঁদুক, আমার চোখে পড়ে গিয়েছিল সঙ্গে-সঙ্গে। যে বিলেতে কয়েক বছর বসবাস করছে, তার পায়ে সোল-ক্ষয়ে-আসা দিশি জুতো কেন! আমি ওর কলেজে খোঁজ-খবর করলাম সঙ্গে-সঙ্গে। কয়েক বছর আগের রেকর্ড বের করতে দেরি হল না। জানতে পারলাম, কলেজে থাকতেই, ক্যালকাটা আর্চারি ক্লাবের সদস্য ছিল। অল ইন্ডিয়া কম্পিটিশনে তীর ছোঁড়ায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। পরে কোনও একটা জঘন্য অপরাধের দরুন কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেয়। তার পরে এক সার্কাসের দলে ভিড়ে বিদেশে চলে যায়। সার্কাস থেকেই যোগাযোগ হয় এক বিখ্যাত স্মাগলার র‍্যাকেটের সঙ্গে। লণ্ডনে পড়াশোনা, ব্যবসা ওসব বানানো গল্প। এত কাঁচা মিথ্যে ও পুলিশের কাছে কোন সাহসে বলেছিল জানি না। এয়ার পোর্টের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে পাত্তা লাগাতে আমাদের কতক্ষণেরই বা মামলা! লন্ডনের এক কিউরিও এজেন্সির এজেন্ট হয়ে ও এদেশেই কাজ করছিল, কী কাজ সেটা অনুমান করা খুব শক্ত নয়। তবে এই সূত্রেই দু'-তিন মাস অন্তর সে বিলেত ঘুরে আসত। মামার সঙ্গে বহুকালই ওর কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ওর হাতেই তাঁর একরকম মর্মান্তিক মৃত্যু হল। সে এক বিচিত্র কাহিনী, পরে বলব।"

নিজের অনুমানের সঙ্গে সবটা না মিললেও অনেকটাই কাছাকাছি গিয়েছিল দেখে সুনন্দ একটুক্ষণ উত্তেজনায় কথা বলতে পারল না। তারপর হঠাৎ মনে পড়তেই বলল, "জীবনদা, অমিয় বোধ হয় বাড়ির ভেতর পড়ে আছে!"

"জানি, আমার লোকেরা দেখছে।" (সমাপ্ত)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

টিনটিন * হার্জ

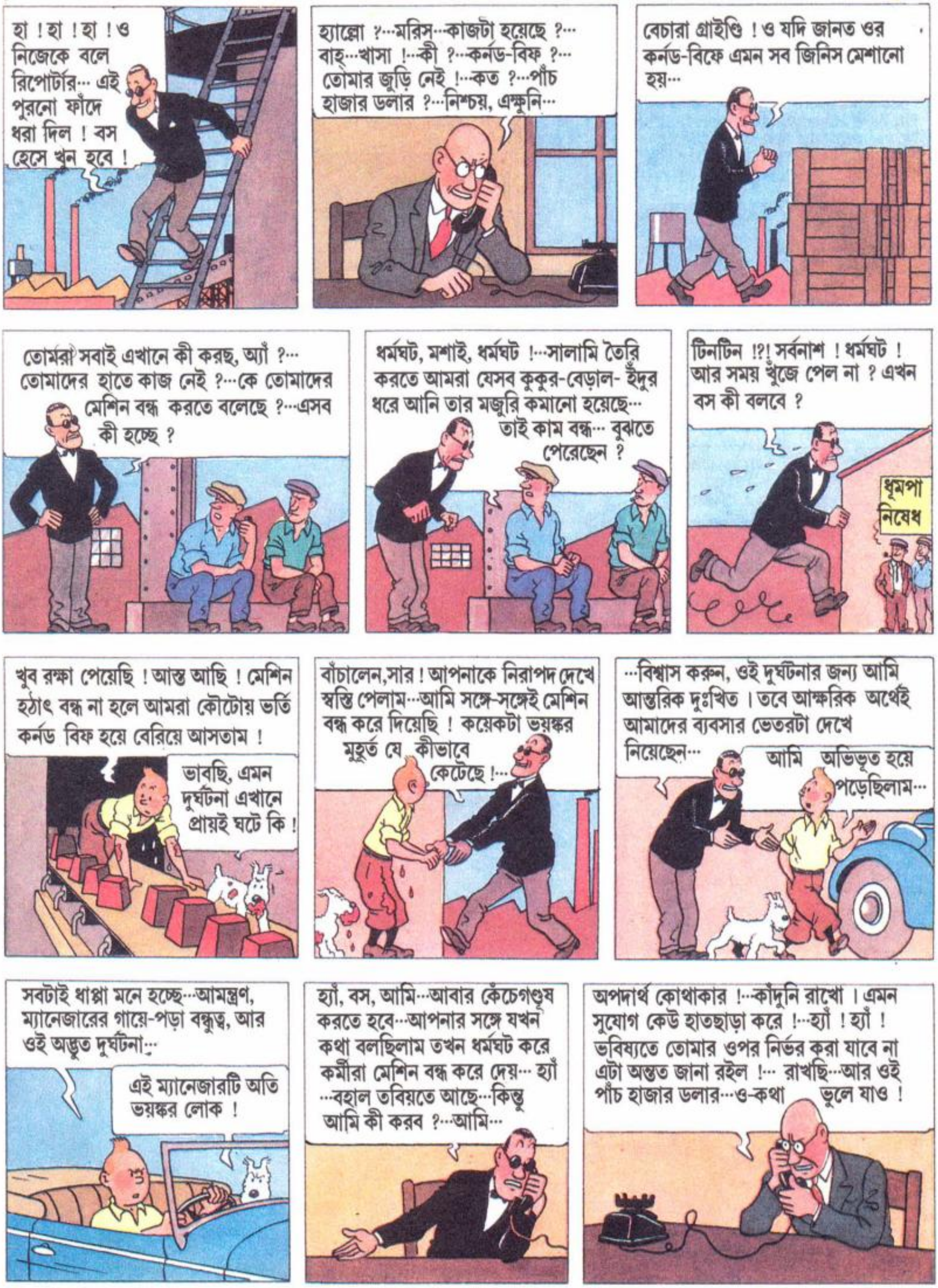
হা ! হা ! হা ! ও নিজেকে বলে রিপোর্টার... এই পুরনো ফাঁদে ধরা দিল ! বস হেসে খুন হবে !
হ্যাল্লো ?...মরিস...কাজটা হয়েছে ?... বাহ্...খাসা !...কী ?...কর্নড-বিফ ?... তোমার জুড়ি নেই !...কত ?...পাঁচ হাজার ডলার ?...নিশ্চয়, এক্ষুনি...
বেচারা গ্রাইণ্ডি ! ও যদি জানত ওর কর্নড-বিফে এমন সব জিনিস মেশানো হয়...
তোমরা সবাই এখানে কী করছ, অ্যাঁ ?... তোমাদের হাতে কাজ নেই ?...কে তোমাদের মেশিন বন্ধ করতে বলেছে ?...এসব কী হচ্ছে ?
ধর্মঘট, মশাই, ধর্মঘট !...সালামি তৈরি করতে আমরা যেসব কুকুর-বেড়াল- ইঁদুর ধরে আনি তার মজুরি কমানো হয়েছে... তাই কাম বন্ধ... বুঝতে পেরেছেন ?
টিনটিন !?! সর্বনাশ ! ধর্মঘট ! আর সময় খুঁজে পেল না ? এখন বস কী বলবে ?
ধূমপান নিষেধ
খুব রক্ষা পেয়েছি ! আস্ত আছি ! মেশিন হঠাৎ বন্ধ না হলে আমরা কৌটোয় ভর্তি কর্নড বিফ হয়ে বেরিয়ে আসতাম !
ভাবছি, এমন দুর্ঘটনা এখানে প্রায়ই ঘটে কি !
বাঁচালেন,সার ! আপনাকে নিরাপদ দেখে স্বস্তি পেলাম...আমি সঙ্গে-সঙ্গেই মেশিন বন্ধ করে দিয়েছি ! কয়েকটা ভয়ঙ্কর মুহূর্ত যে কীভাবে কেটেছে !...
...বিশ্বাস করুন, ওই দুর্ঘটনার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত । তবে আক্ষরিক অর্থেই আমাদের ব্যবসার ভেতরটা দেখে নিয়েছেন...
আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম...
সবটাই ধাপ্পা মনে হচ্ছে...আমন্ত্রণ, ম্যানেজারের গায়ে-পড়া বন্ধুত্ব, আর ওই অদ্ভুত দুর্ঘটনা...
এই ম্যানেজারটি অতি ভয়ঙ্কর লোক !
হ্যাঁ, বস, আমি...আবার কেঁচেগণ্ডূষ করতে হবে...আপনার সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখন ধর্মঘট করে কর্মীরা মেশিন বন্ধ করে দেয়... হ্যাঁ ...বহাল তবিয়তে আছে...কিন্তু আমি কী করব ?...আমি...
অপদার্থ কোথাকার !...কাঁদুনি রাখো । এমন সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে !...হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! ভবিষ্যতে তোমার ওপর নির্ভর করা যাবে না এটা অন্তত জানা রইল !... রাখছি...আর ওই পাঁচ হাজার ডলার...ও-কথা ভুলে যাও !

আমেরিকায় টিনটিন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাটম্যান
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক খুনির অভিযোগে নিহত ব্যক্তির অংশীদার সম্পর্কে তদন্তে এসে ব্যাটম্যান আর রবিন মৃত্যুফাঁদে পড়েছে···
আগুন বারুদের কাছে চলে আসছে ! ভাল ঠেকছে না !
আরও মন্দ হতে পারত !
সাবধান বারুদ
আরও মন্দ আর কী হতে পারে !
শিকলটা নাগালের বাইরে থাকতে পারত !
হুউউস
কিন্তু তাতে কী হবে, ব্যাটম্যান ?
সাবধান বারুদ
মোমবাতি নিভিয়ে দিল ! ভাগ্যিস পাখা চালাবার শিকলটা হাতের নাগালের মধ্যে ঝুলছিল !
হ্যাঁ···ভাগ্য ভাল ! সমূহ বিপদ কেটে গেছে ! এবার দড়ির বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে হবে !
উফ্ ! কী ভাগ্য ! ওরা চেষ্টা করলেও এর চেয়ে পলকা চেয়ার জোগাড় করতে পারত না !
আমিও সেই কথা ভাবছিলাম ! এবার দড়ি ছিঁড়তে হবে !
ফট
কয়েক মিনিট বাদে···
বোকাটা বলে ফেলেছে যে, স্টিল ওদের বস ! জানা গেল বাওয়ার নির্দোষ আর স্টিলই ডোরিয়ানকে খুন করে বইগুলি চুরি করেছে !
সেইরকমই মনে হচ্ছে ! স্টিলের বাড়ি এসে গিয়েছি !
বাড়িতে কেউ নেই ! দেরাজ ফাঁকা···আলমারি খোলা !
পাখি উড়ে গেছে ! ওর পোশাকের আলমারি খালি !
বুঝেছি ! গুণ্ডারা আমাদের পালাতে দেখে স্টিলকে খবর দিয়েছে ! আমরা আসার আগেই ও পালিয়েছে !
তাই হবে···আরে, এটা কী ! 'ভলতেয়ার' ! এই সংস্করণটা চুরি-যাওয়া বইয়ের তালিকায় ছিল ! তাড়াহুড়োয় স্টিল ফেলে গেছে !
ব্যাটম্যান, শোনো ! "১৫ চ্যাথাম ড্রাইভের হোরেস হকিন্স প্রথম সংস্করণের বই চায়···যেভাবেই হোক ! বই বিক্রির সময় ওকে মনে রাখতে হবে।"
বাহ্ ! স্টিলের ওই লেখা থেকে মনে হচ্ছে চোরাই বই বিক্রি করে জলদি নগদ টাকা কামাতে ও হকিন্স-এর কাছে গেছে··· জলদি ওখানে চলো !
ব্যাটম্যান যখন ছুটছে, বাওয়ারের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে···
এখন ক'টা বাজে ?
দশটা ! তোমার আয়ু আর দু' ঘণ্টা !
১৫ চ্যাথাম ড্রাইভ···
না, মিঃ স্টিল ? আমি বই চাই, কিন্তু রক্তমাখা বই নয় ! ও বই আমি মাগনাও নেব না !
পেয়েছি !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রাজকুমার দৃঢ়র পলায়নের খবর ছন্ত্রী পেয়ে গেলেন সেই রাতেই।

প্রথমেই তিনি বেশি উত্তেজিত হলেন না। শুম্ভ আর নিশুম্ভকে ডেকে পাঠালেন রাজপ্রাসাদে।

অমন দুই জোয়ান সৈন্য শুম্ভ আর নিশুম্ভ, তারাও ছন্ত্রীর সামনে এসে ভয়ে কাঁপে। কাঁপতে-কাঁপতে তারা ছন্ত্রীর পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল।

ছন্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা আমার দু'জন অতি বিশ্বাসী প্রহরী। প্রতি রাতে কালাঘর বন্দীশালা পাহারা দেওয়ার ভার তোমাদের ওপর দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। তবু একজন বন্দী পালাল কী করে?"

শুম্ভ বলল, "প্রভু, আমরা তো বন্দীদের পালাতে দিইনি। আমাদের চোখ এড়িয়ে একটি মাছিও কালাঘর থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারে না।"

নিশুম্ভ বলল, "আমরা ঠিক সময়েই এক বিশ্বাসঘাতক রক্ষী ও এক বন্দীর ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছি, তাদের প্রতিরোধ করেছি!"

ছন্ত্রী বললেন, "তবু তারা পালিয়েছে, এ-কথাও ঠিক!"

শুম্ভ বলল, "না, প্রভু, তারা পালাতে পারেনি। তারা আত্মহত্যা করেছে। দুর্গ-প্রাকারে যেখানে ওদের ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ওদের ধরা না দিয়ে উপায় ছিল না। তারপর ওরা নদীতে লাফিয়ে পড়ল। ওখান থেকে লাফালে ওদের মৃত্যু নিশ্চিত।"

ছন্তী বললেন, "মৃত্যু নিশ্চিত ? তবে তাদের মৃতদেহ গেল কোথায় ? আমি সেই পলাতকদের মৃত মুখ দেখতে চাই !"

নিশুম্ভ বলল, "ওরা লাফাবার পরই আমরা ছুটে নীচে গিয়ে দুর্গের বাইরে, নদীর ধারে খোঁজ করেছি, কিছু দেখতে পাইনি । তবে নদীতে খুব স্রোত ছিল । ওদের মৃতদেহ স্রোতে ভেসে গেছে ।"

ছন্তী বললেন, "কত দূর ভেসে যাবে ? মৃতদেহ প্রথমেই ভেসে ওঠে না, কোনও পাথরে লেগে জলের মধ্যে ডুবে থাকতেও পারে । তোমরা ধীবরদের ডেকে জাল ফেলে দেখেছ ?"

শুম্ভ আর নিশুম্ভ নীরব রইল ।

ছন্তী বসলেন, "এক্ষুনি গিয়ে অন্তত দশজন ধীবরকে সংগ্রহ করো । নদীতে জাল ফ্যালো । যে-কোনও উপায়ে মৃতদেহ দুটি এনে আমাকে দেখাবে । আমি তোমাদের এখনও কোনও দোষ ধরছি না । কিন্তু ওই দুই পলাতকের মৃতদেহ যদি আমাকে দেখাতে না পারো, তা হলে তোমাদের কঠিন শাস্তি দেব ! এ দেশে তোমাদের স্থান হবে না, মনে রেখো !"

শুম্ভ-নিশুম্ভ বিদায় নেওয়ার পর ছন্তী কালাঘরের অধ্যক্ষ মল্লপালকে ডেকে বললেন, "তোমার কারাগার থেকে একজন রক্ষী আর এক বন্দী পালিয়েছে, এ দায়িত্ব কার ? তোমার নিশ্চয়ই । তোমাকে কী শাস্তি দেব ?"

মল্লপাল মাথা নিচু করে বলল, "প্রভু, দায়িত্ব অবশ্যই আমার । আপনি আমাকে যে শাস্তিই দেবেন, তা মাথা পেতে নেব ।"

ছন্তী বললেন, "মৃত্যুদণ্ডই তোমার প্রাপ্য । কাল সকালে তোমাকে শূলে দেওয়া উচিত, তাই না ? সে বিষয়ে পরে বিবেচনা করছি । তার আগে বলো, এই বন্দীর পলায়নের সংবাদ কি তলতাদেবী পেয়েছেন ?"

মল্লপাল বলল, "না প্রভু ! সে বিষয়ে আপনাকে আমি নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে পারি । আমার কারাগারে সবচেয়ে মূল্যবান বন্দী ওই দু'জন । এর মধ্যে একজনের পলায়নের সংবাদ শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি প্রাক্তন রানির কক্ষের দিকে ছুটে যাই । তিনি তখন ঘুমন্ত ছিলেন । আমি নিজে সেখানে পাহারা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম ।"

ছন্তী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন তুমি এখানে এসেছ, এখন সেখানে কে রয়েছে ?"

মল্লপাল বলল, "আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে সেখানে বসিয়ে রেখে এসেছি, প্রভু । তাকে কঠোর নির্দেশ দিয়ে এসেছি, বোবা-কালা প্রহরী ছাড়া আর কেউ যেন কিছুতেই না ঢুকতে পারে ।"

ছন্তী দু'বার মাথা নেড়ে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ।

তারপর বললেন, "হ্যাঁ, এই কাজটার জন্য তোমার অপরাধ কিছুটা কমে গেছে বটে । মল্লপাল, তোমার মতন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে আমার মন চায় না । তোমাকে আমি অন্য কাজের ভার দেব । তুমি এই প্রাসাদেই নীচে অপেক্ষা করো । সকাল হলে তোমাকে দেশান্তরে যেতে হবে !"

সারা রাত ছন্তী ঘুমোতে পারলেন না ।

পায়চারি করতে-করতে ছন্তী বহু কথা চিন্তা করতে লাগলেন । এক-একবার তিনি ঘুমন্ত রাজকুমার তীক্ষ্ণর শিয়রের কাছে গিয়ে দাঁড়ান । তীক্ষ্ণ এখন সদ্য কৈশোর ছাড়িয়েছে, তার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে বুদ্ধির দীপ্তি । এই বয়েসেই সে তলোয়ার খেলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে প্রায় ।

অন্যান্য দিনের মতনই তীক্ষ্ণ ঘুম থেকে ওঠার পর এক বৃদ্ধ পণ্ডিতের কাছে শাস্ত্র-পাঠ নিল । তারপর সে উদ্যানে গেল অন্য এক

শিক্ষকের কাছে অস্ত্রচালনার শিক্ষা নিতে ।

সেই সময় ছন্তী এসে দাঁড়ালেন তার পাশে ।

স্নেহ-কোমল স্বরে বললেন, "কুমার তীক্ষ্ণ, তোমার হস্ত-ক্ষিপ্রতা ও অস্ত্র-দক্ষতা দেখে আমি খুবই প্রীত হয়েছি । তুমি এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজা হওয়ার পুরোপুরি যোগ্য । কিন্তু সিংহাসনে বসবার আগে আমি তোমাকে একটি দায়িত্ব দিতে চাই ।"

কুমার তীক্ষ্ণ বিনীতভাবে বলল, "আদেশ করুন, প্রভু !"

ছন্তী বললেন, "আমাদের পাশের রাজ্যে জয়রাম নামে এক ব্যক্তির খুব নাম শোনা যাচ্ছে । জয়রাম ওই রাজ্যের রাজার শ্যালক । সে সবাইকে গর্ব করে বলে বেড়াচ্ছে যে, তলোয়ার চালনায় তার তুল্য বীর আর ভূ-ভারতে কেউ নেই । বেশ কিছু যোদ্ধাকে সে পরাজিতও করেছে । তার এই অহঙ্কার আমার সহ্য হচ্ছে না । তোমার মতন একজন বীর থাকতে এমন কথা সে বলে কী করে ? তাই আমি তোমাকে ছত্রপুরে পাঠাতে চাই । তুমি জয়রামকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে পরাজিত করবে, তার অহঙ্কার চূর্ণ করবে ! তুমি এই প্রস্তাবে রাজি ?"

কুমার তীক্ষ্ণ বলল, "আপনি আদেশ করলে অবশ্যই রাজি আছি ।"

ছন্তী বললেন, "এটা আমার আদেশ নয় । আমার অভিপ্রায় । তুমি ভেবে দেখো ।"

কুমার তীক্ষ্ণ বলল, "ভেবে দেখার কিছু নেই । আমাকে কবে যেতে হবে বলুন ?"

ছন্তী বললেন, "শুভস্য শীঘ্রম । আজই যাত্রা করো তা হলে !"

রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে ছন্তী কারারক্ষী মল্লপাল আর সেনাপতি বলভদ্রকে একসঙ্গে ডেকে পাঠালেন । দু'জনকে সামনে বসিয়ে তিনি বললেন, "আগেকার দিনের রাজারা যেমন দিগ্বিজয়ের জন্য রাজকুমারদের পাঠাতেন, আমিও সেইরকম কুমার তীক্ষ্ণকে দেশে-দেশে পাঠাতে চাই । রাজ্য জয় করার বদলে সে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি ঘুরে-ঘুরে খ্যাতনামা বীরদের সঙ্গে অস্ত্র যুদ্ধে নামবে । আমার নিশ্চিত ধারণা, সে সর্বত্র জয়ী হবে । সকলকে পরাজিত করার পর সে দিগ্বিজয়ীর বেশে এই দেশে ফিরবে । তখন

তাকে আমি সিংহাসনে বসাব। আজই সে যাবে ছত্রপুরে জয়রামের সঙ্গে লড়াই করতে!"

সব শুনে বলভদ্র বলল, "প্রভু, আপনার প্রস্তাব অতি উত্তম। কিন্তু আর কয়েকটি বছর অপেক্ষা করলে হয় না? কুমার তীক্ষ্ণ এখনও বালক মাত্র!"

ছত্রী বললেন, "কুমারের ষোলো বছর বয়স হয়েছে। ষোলো বছরের যুবকদের বাবা-মায়েরা বালক মনে করে বলেই তো অধিকাংশ যুবক নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। ষোলো বছরের যুবকরা কী না পারে! ইচ্ছে করলে তারা বিশ্বজয় করতে পারে।"

বলভদ্র বললেন, "প্রভু, আপনি ছত্রপুরের জয়রামকে দেখেছেন? তার দৈত্যের মতন চেহারা। সেই তুলনায় কুমার তীক্ষ্ণর ছোটখাটো শরীর। এ দু'জনের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হবে কী করে? এ যেন সিংহের সঙ্গে খরগোশের লড়াই!"

ছত্রী বললেন, "বিরাট চেহারা হলেই বড় বীর হয় না। সমস্ত যুদ্ধই হয় বুদ্ধি দিয়ে। কুমার তীক্ষ্ণ অসম্ভব বুদ্ধিমান। সে জয়ী হবেই। বলভদ্র, তুমি সব ব্যবস্থা করে দাও! শিবির নিয়ে লোকজন যাবে কুমারের সঙ্গে। আর মল্লপালও থাকবে কুমারের পাশে-পাশে। জয়রামকে পরাজিত করার পর তাকে নিয়ে যাবে মল্লারপুরে। সব ক'টি রাজ্যের বীরদের ধরাশায়ী করতে কুমারের যদি চার-পাঁচ বছর লেগে যায় তো লাগুক!"

বলভদ্রের তবু বিস্ময় কাটল না। সকলেই জানে, ছত্রী কুমার তীক্ষ্ণকে নিজের পুত্রের মতন ভালবাসেন। সব সময় তাকে চোখে-চোখে রাখেন। সেই ছত্রী এতদিনের জন্য তীক্ষ্ণকে চোখের আড়ালে পাঠাচ্ছেন কেন, তাও বিপদের মধ্যে?

বলভদ্র জিজ্ঞেস করল, "প্রভু, কুমার যদি বাইরের কোনও যোদ্ধার কাছে পরাজিত হয়, তা হলে কী হবে? তখন তার জীবন সংশয় হতে পারে!"

ছত্রী গম্ভীর ভাবে বললেন, "যদি কুমার তীক্ষ্ণ কারও কাছে পরাজিত হয়, তা হলে বুঝতে হবে, সে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হওয়ার উপযুক্ত নয়। এ-রাজ্যের প্রজারা কোনও দুর্বল রাজা চায় না। কুমার আমার নয়নের মণি, তবু আমি তাকে বাইরে পাঠাচ্ছি উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণর যাত্রার ব্যবস্থা করে দিয়ে ছত্রী বললেন, "কালকের দুই পলাতকের মৃতদেহ পাওয়া গেল? আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।"

কিন্তু জয়পাল ও রাজকুমার দৃঢ়র মৃতদেহ পাওয়া গেল না শেষ পর্যন্ত।

নিশ্চিত মৃত্যুর কথা ভেবেই দু'জনে দুর্গ-প্রাকার থেকে লাফ দিয়েছিল। জলে পড়ার পর দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কুমার দৃঢ় প্রবল স্রোতের টানে ভাসতে-ভাসতে চলে যায় অনেক দূর। সেই স্রোতস্বিনী নদী দুটি রাজ্য পেরিয়ে নির্দিষ্ট দেশে আসবার পর, কুমারের দেহ আটকে গেল একটা দ্বীপে।

সেখানকার নদীর ঘাটে কয়েকজন স্ত্রীলোক কাপড় কাচছিল। প্রথমে একটা মৃতদেহ দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল। একটু দূরে পালিয়ে যাওয়ার পরে তাদের একজন বলল, "আহা, কী ফুটফুটে, সুন্দর মানুষটি। সত্যিই মরে গেছে কি না দ্যাখ তো!"

তারা আবার ফিরে এসে দেহটি টেনে তুলল ঘাটে। কুমারের শরীরে আঘাতের চিহ্ন নেই। একটু-একটু যেন উত্তাপ আছে। যেন বেঁচে আছে মনে হয়।

তখন তারা ডেকে আনল গ্রামের মোড়লকে।

কুমারের শরীর ধুয়ে-মুছে, গরম জলের খানিকটা সেঁক দেওয়ার পর এক সময় সে চোখ মেলল।

গ্রামের মোড়ল বলল, "চেহারা দেখে মনে হয় কোনও বড় ঘরের সন্তান। ঠিক যেন রাজপুত্তুর। হে বিদেশী, আপনি কে?"

রাজকুমার দৃঢ় ঘোলাটে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। দিনের আলোয় তার চোখে যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে, তবু সে চোখ ঢাকল না। হাত তোলার মতন সামর্থ্যও তার নেই।

মোড়ল বারবার 'আপনি কে? আপনি কে?' জিজ্ঞেস করলেও কুমার কোনও উত্তর দিতে পারল না। তার কিছুই মনে পড়ছে না।

অত উঁচু থেকে নদীর জলে পড়ার ফলে কুমারের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। তার স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গেছে। নিজের নামটাও তার মনে নেই।

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

গল্‌ফ খেলার ইতিহাস

গল্‌ফ খেলা বেশ প্রাচীন। বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম গল্‌ফ ক্লাবটি আছে কলকাতায়।

গল্‌ফ খেলার উৎস সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। তবে, খেলাটি সম্ভবত হল্যান্ডে প্রথম প্রচলিত হয়েছিল। স্কটল্যান্ডে কখন কীভাবে খেলাটির প্রচলন হল তা নিয়েও প্রায় কিছুই জানা যায় না। তবে জানা যায়, ১৪৫৭ সালেরও আগে স্কটল্যান্ডে গল্‌ফ খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৪৫৭ সালে স্কটল্যান্ডের পার্লামেন্টে এই খেলাটি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, তীরন্দাজির মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলাও এই খেলার জন্য জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। ১৫৯২ সালে এডিনবরা শহরের কাউন্সিলর এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তাতে বলা হয়, শহরের নাগরিকরা রবিবার গল্‌ফ বা এই জাতীয় কোনও খেলা নিয়ে সময় কাটাতে পারবেন না। ইতিহাস যাই হোক না কেন, গল্‌ফ বহুদিন আগেই স্কটল্যান্ডের জাতীয় খেলা হিসেবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। স্কটদের জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল এই খেলা; প্রায় সকলেই এই খেলা জানত, এর ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করত। বক্তৃতা, লেখা সর্বত্রই এই খেলার উদাহরণ দেওয়া হত। উদাহরণ হিসেবে সার ওয়াল্টার স্কটের 'রেড গন্টলেট' উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। উপন্যাসের এক জায়গায় মিঃ ফেয়ারফোর্ড তাঁর ছেলেকে বোঝাচ্ছেন যে, সব-কিছু তার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে আছে, 'টিড বলের মতো।' তাঁর প্রিয় খেলা থেকে ঔপন্যাসিক এখানে এমন একটি উপমা দিয়েছেন যা খুব সহজেই সকলে বুঝতে পারবে।

স্কটল্যান্ডে গল্‌ফ খেলার পরিচয় ছিল প্রাচীন, সম্ভ্রান্ত এক রাজকীয় খেলা হিসেবে। বহু স্কট রাজাই নাকি গল্‌ফ খেলতেন। রাজা প্রথম চার্লস ও দ্বিতীয় জেমস এই খেলা খুব ভাল জানতেন। ১৮৩৪ সালে রাজা চতুর্থ উইলিয়ম সেন্ট অ্যাণ্ড্রুজ গল্‌ফ ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই ক্লাবটি এখনও পৃথিবীর একটি অন্যতম প্রধান গল্‌ফ ক্লাব।

উনিশ শতকের শেষদিক থেকে গল্‌ফ খেলা প্রায় সমস্ত ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। চেশায়ারের হয়লেক বা কেন্ট-এর স্যান্ডউইচ-এর মতো বিখ্যাত গল্‌ফ মাঠগুলি এই সময়েই কাটা হয়েছিল। পেশাদারি গল্‌ফার মাত্রেই স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা, এই ধারণাও বিদায় নিল। চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলার জন্য ইংল্যান্ডের মাঠগুলিও বেছে নেওয়া হল। ইংরেজ গল্‌ফাররা এই সময় থেকেই বলে বেড়াতে লাগলেন, তাঁদের উত্তরের প্রতিবেশী স্কটল্যান্ডের খেলোয়াড়দের তুলনায় তাঁরাও এমন-কিছু কমতি নন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিখ্যাত গল্‌ফার-রা প্রায় সকলেই ইংরেজ। জে. এইচ. টেলর, জেমস ব্রেইড, হ্যারি ভার্ডন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নাম।

গল্‌ফ খেলা এখন পৃথিবীর বহু দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার 'রয়্যাল ক্যালকাটা গল্‌ফ ক্লাব' পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম গল্‌ফ ক্লাব। ১৮৯০ সালের আগে আমেরিকানরা এই খেলাটি জানতেন না। আজকের আমেরিকান গল্‌ফার-রা অনেকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। এই খেলার উন্নতিসাধনে তাঁদের প্রচুর অবদান আছে।

বর্তমানে ব্রিটেনে প্রায় দু' হাজার গল্‌ফ ক্লাব রয়েছে। বড়-বড় বিখ্যাত 'চ্যাম্পিয়ানশিপ কোর্স' (বড় খেলার মাঠ) যেমন রয়েছে, তেমনই আছে সাধারণ জনসাধারণের জন্য অসংখ্য ছোট-ছোট খেলার মাঠ বা গল্‌ফ-লিঙ্ক। ব্যক্তিগত ক্লাবগুলি চলে সদস্যদের টাকায়, বাইরের কেউ যদি সাময়িকভাবে গল্‌ফ-মাঠটি ব্যবহার করতে চান, তাঁকে 'গ্রিন ফি' নামে কিছু টাকা দিতে হয়। সাধারণ মাঠে, সামান্য কিছু অর্থ দিয়ে সবাই খেলতে পারে। বড়-বড় ক্লাবগুলিতে সর্বক্ষণের জন্য একজন পেশাদার গল্‌ফার নিয়োগ করা হয়। তিনি খেলা শেখান ও দোকান দেখেন। ক্লাবের নিকটবর্তী সে দোকানে বল, লাঠি ইত্যাদি নানা খেলার সরঞ্জাম পাওয়া যায়। মাঠটিকে ঠিকঠাক রাখার জন্য মালীও রাখা হয়। অনেক বিখ্যাত পেশাদার গল্‌ফার প্রথম জীবনে 'ক্যাডি' ছিলেন। ক্যাডি আর কিছুই নয়, একদল ছোট ছেলে যারা খেলোয়াড়দের ব্যাগ বহন করে মাঠে নিয়ে যায়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পৃথিবীর সব শ্রেণীর মানুষের কাছে আজ গল্‌ফ শারীরচর্চা ও অবসর বিনোদনের জন্য এক অন্যতম জনপ্রিয় উপায়। সাত বছর বয়সে একটি ছোট ছেলে গল্‌ফ খেলা শুরু করতে পারে এবং সত্তর বছর বয়সেও সে অনায়াসে এই খেলা চালিয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন

নিল ও'ব্রায়েন

(১) "অসম্ভব শব্দটি লেখা আছে মূর্খের অভিধানে"—এই উক্তিটি কার ? **চন্দ্রলেখা ঘোষ**, কসবা ।
(২) NATO বা ন্যাটো কী ? **রাতুলকুমার দাস**, তমলুক, মেদিনীপুর ।
(৩) মঙ্গল গ্রহের দুটি উপগ্রহের নাম কী ? **নাসিব আলি**, রসুলপুর বি এস হাই স্কুল, বর্ধমান ।
(৪) 'দ্য প্রিন্স' গ্রন্থের রচয়িতা কে ? **শমীক চক্রবর্তী**, হরিনাভি, চব্বিশ পরগনা ।
(৫) পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রীর নাম কী ? **ডোডো দাশগুপ্ত**, কলকাতা-১৪ ।
(৬) রিচার্ড হ্যাডলির চারশোতম শিকার কে ? **রীনা দে**, চেতলা ।
(৭) ডেনমার্কের রাজধানীর নাম কী ? **আলো আলি**, বর্ধমান ।
(৮) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী ? **শক্তিপদ পরামানিক**, মামুদপুর ।
(৯) কোন ভারতীয় সর্বপ্রথম টেস্ট খেলেন ? **অনীককুমার সাঁই**, বর্ধমান ।
(১০) ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিংহ কোন লোকসভা আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ? **সমর দে**, কলকাতা-২৭ ।
(১১) কোন খেলোয়াড় (ফুটবল) এ-বছর 'ইন্টারন্যাশনাল ফুটবলার অব দ্য ইয়ার' হয়েছেন ? **কৌস্তুভ সরকার**, আলিপুর ।
(১২) মার্কো ভ্যান বাস্তেন কোন ক্লাবের হয়ে ইতালীয় লিগে খেলেন ? **অরূপ সমাজদার**, কলকাতা-৪৫ ।
(১৩) কোন শহর 'হোম অব জ্যাজ' নামে পরিচিত ? **সায়ন্তন চক্রবর্তী**, কলকাতা-৬ ।
(১৪) কোন দেশকে 'দ্য ল্যান্ড অব মর্নিং কাপ' বলা হয় ? **সমর হালদার**, কলকাতা-৯ ।
(১৫) মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের হত্যাকারীর নাম কী ? **সোমেশ্বর ও স্বর্ণপ্রতিম**, সল্ট লেক ।
(১৬) ভারতের কোন রাজ্যে ডিন্ডা নাচ প্রচলিত ? **অনমিত্রা**, কলকাতা-৬৪ ।
(১৭) প্রথম লিখিত পরীক্ষা কোন কলেজে নেওয়া হয় ? **শ্রাবণী মজুমদার**, রানাঘাট ।
(১৮) বাষ্পীয় এঞ্জিন আবিষ্কার করেন কে ? **সেখ আবদুল হাসিম**, গোবিন্দপুর হাই স্কুল, বর্ধমান ।
(১৯) ১৯৮৯ সালে মধ্যপ্রদেশ সরকার প্রদত্ত 'কালিদাস পুরস্কার' কে পেয়েছিলেন ? **অরূপরতন আইচ**, কোন্নগর ।
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) Being Myself.
(২) ভারতের কপিলদেব ও পাকিস্তানের জাভেদ মিয়াঁদাদ ।
(৩) কিছুই না ।
(৪) হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
(৫) জীবনানন্দ দাশ
(৬) সিনাগগ ।
(৭) পোস্টমাস্টার, মণিহারা, সমাপ্তি ।
(৮) পেইন্টাল ।
(৯) বিক্রম শেঠ ।
(১০) উত্তরপ্রদেশ ।
(১১) এঁদের প্রত্যেকেরই একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হ্যাট্রিক আছে ।
(১২) দলাইলামা ।
(১৩) মুফতি মহম্মদ সঈদ ।
(১৪) শচীন তেন্ডুলকর ।
(১৫) লাসা ।
(১৬) বভ্রুবাহন ।
(১৭) বিষেন সিং বেদী ।
(১৮) মেদিনীপুর শহরে ।

জীবনানন্দ দাশ

শচীন তেন্ডুলকর

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

দলাই লামা

কুইজ

বিষয় : কানাডা

(১) আয়তনের দিক থেকে বিচার করলে কানাডা পৃথিবীতে কত নম্বর স্থান অধিকার করে ?

(২) কানাডার জাতীয় প্রতীক কী ?

(৩) 'মাউন্টিরা তাদের মানুষ পায় ।'—এই কথার অর্থ কী ?

কানাডার জাতীয় পতাকা

(৪) সেন্ট লরেন্স নদী কানাডার প্রধান প্রবেশপথ । কে এই নদী আবিষ্কার করেছিলেন ?.

(৫) মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকের প্রতীক কী ছিল ?

(৬) কানাডার দুটি সরকারি ভাষা কী কী ?

(৭) 'কানাডা বালসাম' প্রকৃতপক্ষে কোনও 'বালসাম' বা 'সুগন্ধি দোপাটি ফুল' নয়, এটি আসলে কী ?

লেক অন্টারিও ও হুরির মধ্যে খালপথে জাহাজ

(৮) 'কানাডা কাপ' এখন কী নামে পরিচিত ?

(৯) কানাডার সেনাবাহিনীর একটি দলের নামে কয়েকটি ব্যায়াম আছে । এই সৈন্যদলটির নাম কী ?

(১০) 'কানাডিয়েন' কাকে বলে ?

(১১) কানাডার পূর্বতম সীমান্তের রাজ্যটির নাম নিউফাউন্ডল্যান্ড । এই প্রদেশটির নামেই নিউফাউন্ডল্যান্ড কুকুরের নাম রাখা হয়েছে । এই কুকুর মানুষের কী উপকার করে ?

(১২) কানাডার সাডবারি শহর কোন কোন ধাতুর খনির জন্য বিখ্যাত ?

(১৩) 'ব্যারেন ল্যান্ডস' বা 'অনুর্বর জমি' কাকে বলে ?

(১৪) উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের বৃহত্তম দ্বীপটি কানাডার অন্তর্গত । এই দ্বীপের নাম কী ?

(১৫) মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকের উদ্যোক্তা দেশ ছিল কানাডা । কানাডা সেবার একটি বিরল দুর্ভাগ্য অর্জন করেছিল । পৃথিবীর আর কোনও ওলিম্পিকের উদ্যোক্তা দেশের কপালে এই দুর্ভাগ্য জোটেনি । কী সেই দুর্ভাগ্য ?

(১৬) কানাডার ইয়ুকোন প্রদেশে বিশাল খাড়া পর্বত রয়েছে, এই প্রদেশে শীতের প্রকোপও ভীষণ । এইসব কারণে এই প্রদেশে জনসংখ্যা খুব কম । ১৯৮০ সাল থেকে এখানে হঠাৎ বহু লোকজন এসে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে । কেন ?

(১৭) কানাডার রাজধানীর নাম কী ?

(১৮) 'রামধনু সেতু' বা 'রেনবো ব্রিজ' কোথায় আমেরিকা ও কানাডাকে সংযুক্ত করেছে ।

(১৯) কানাডার সবচেয়ে বিখ্যাত (ও কুখ্যাত) অ্যাথলিটের নাম বেন জনসন । তিনি আসলে কোন দেশের লোক ?

(২০) কানাডার কিউবেক শহরে ফরাসি-ভাষী লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি । এই শহরের লোকদের কী বলা হয় ?

(ক)

(খ)

প্রশ্ন

(ক) কানাডার এক বিখ্যাত রাষ্ট্রনেতা । এঁর নাম কী ?

(খ) এই জলপ্রপাতের নাম বলো ।

(গ) উত্তর কানাডার এই অঞ্চলের নাম কী ?

(গ)

ছবির পরিচয় : (ক) কানাডার প্রধানমন্ত্রী ব্রায়ান মুলরোনি । (খ) নায়াগ্রা । (গ) তুন্দ্রা ।

উত্তর : (১) সোভিয়েত ইউনিয়নের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ । (২) মেপল পাতা । (৩) রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশকে কানাডায় 'মাউন্টি' বলে ডাকা হয় । কোনও অপরাধীর পিছনে একবার ছুটলে তারা ঠিক তাকে ধরে ফেলত । এই ঘটনা থেকেই এই কথার উৎপত্তি । (৪) জ্যাকস কার্টার নামে এক ফরাসি । (৫) আমিক নামে এক বীবর (বিভার) । (৬) ইংরেজি ও ফরাসি । (৭) এক ধরনের তার্পিন তেল । (৮) ওয়ার্ল্ড কাপ ফর গলফ । (৯) কানাডিয়ান এয়ার ফোর্স এক্সারসাইজেস । (১০) ফরাসি কানাডিয়ান । (১১) এই কুকুর ঠাণ্ডা জল সহ্য করেও খুব ভাল সাঁতরাতে পারে । সমুদ্রে ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার করার জন্য এই জাতীয় কুকুর বিখ্যাত । (১২) নিকেল ও তামা । (১৩) কানাডার উত্তর উপকূল জুড়ে আছে বিশাল তুন্দ্রা অঞ্চল । এখানে কোনও গাছ নেই । (১৪) ভ্যাঙ্কুবার দ্বীপ । (১৫) উদ্যোক্তা দেশ সেবার একটিও স্বর্ণপদক পায়নি । (১৬) ওই অঞ্চলে সোনার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল । (১৭) অটোয়া । (১৮) নায়াগ্রা জলপ্রপাত । (১৯) জামাইকা । (২০) কিউবিকোইস ।

ক্রিসমাসের দিন

ক্রিসমাসের রাত্রে মহামুশকিলে পড়েছেন বৃদ্ধ সান্তাক্লজ। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি এনেছেন নানা উপহার। কিন্তু, একটু দেরি করে ফেলেছেন। এদিকে তুষারঝড়ও উঠেছে চারদিকে। কী করেন, ছাদের ইট সরিয়ে ঢুকে পড়লেন বাড়িতে। তারপর এ-দরজা ও-দরজা খুলে অচেনা বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিছুতেই ছোটদের খুঁজে পাচ্ছেন না। তার বদলে গিয়ে পড়লেন ইঁদুরদের মাখন আর বিস্কুটের ভোজসভায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ছোটদের খুঁজে পেলেন তিনি, দেখলেন তিনি আসবেন বলে তারা মাথার কাছে নতুন মোজা নিয়ে শুয়েছে। উপহার দিয়ে ফেরবার পথে নিজের মনে ভাবলেন সান্তাক্লজ, যদিও শহরটা খুব তাড়াতাড়ি পালটে যাচ্ছে, চিমনি বাস টেলিভিশন আরও কত কী—তবু প্রত্যেকের কাছেই এখনও আগের মতোই আছে নিজের নিজের ক্রিসমাস। বইটির নাম—ক্রিসমাস স্টকিংস। লেখক ম্যাথু প্রাইস। ছবি এঁকেছেন—এরল লে কেইন (অ্যাঙ্গাস অ্যান্ড রবার্টসন। দাম : ৫·৯৯ পাউন্ড)।

বইটির প্রসঙ্গে দুঃখের একটি খবর হল, ছোটদের বইয়ের ছবি আঁকার জন্য বিখ্যাত এরল লে কেইন, ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি বইটি দেখে যেতে পারেননি। প্যাস্টেলে আঁকা তাঁর ছবিগুলি এ-বইয়ের সম্পদ।

নানারকম কুসংস্কার

শালিখ দেখলে সঙ্গে-সঙ্গে ভয় করে, ক'টা দেখলাম ? একটা না দুটো ? মইয়ের তলা দিয়ে যেতে কেউ-কেউ একদম নারাজ। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় শুনতে পাওয়া গেল হাঁচির শব্দ। ব্যস্, যাওয়া বন্ধ। আমাদের প্রত্যেকেরই এরকম নানা কুসংস্কার আছে। নানা দেশের, নানা অঞ্চলের, নানা জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত যত কুসংস্কার তার প্রত্যেকটির হদিস পাওয়া যাবে, এমন একটি অভিধান সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। নাম : ডিক্শনারি অব সুপারস্টিশন্স। সম্পাদক : আইওনা ওপি ও মইরা টাটেম। অক্সফোর্ড প্রকাশনা, দাম : ৩০ ডলার।

বইটি পড়লে কত যে অজানা কথা জানা যায় ! নাবিকরা কখনও এক দেশলাই কাঠি থেকে তিনজনে সিগারেট ধরায় না। তাদের কুসংস্কার তাতে তৃতীয়জনের মৃত্যু হবে। রোমান লেখক প্লিনি-র মতে খরগোশের পায়ের হাড় পকেটে রাখলে বাত সেরে যায়। এরকম নানা অদ্ভুত-অদ্ভুত কুসংস্কারের কাহিনী।

বইটি পড়লে বোধ হয় আমাদেরও কুসংস্কার অনেক কমে যাবে।

গল্প, ছড়া এবং ছবি

উদ্ভট বিষয় নিয়ে মজার-মজার ছড়া পড়তে কার না ভাল লাগে ! তার সঙ্গে সেইসব অদ্ভুত যন্ত্রপাতি, খ্যাপাটে বৈজ্ঞানিক, অবাস্তব জন্তু-জানোয়ার, অসম্ভব ফল-ফুল,

পাখাওলা গাড়ি—এসবের জলজ্যান্ত ছবিও যদি থাকে সারা বইতে ছড়িয়ে—তা হলে তো কথাই নেই। শুধু এসব ছড়া-ছবিই নয় তার সঙ্গে আছে নানারকম গল্পও। বইটির নাম : স্টাফ অ্যান্ড ননসেন্স। সম্পাদক লরা সিসিল। সম্পাদক নিজে বইটিতে দারুণ একটা ছড়াও লিখেছেন—'ভোরেসিয়াস ভ্যাকুয়াম ক্লিনার'। ছবি এঁকেছেন এম্মা বিসেস্টার। বইটি প্রকাশ করেছেন বডলি হেড প্রকাশনা সংস্থা। দাম : ৮·৯৫ পাউন্ড।

অভীক মজুমদার

সহজ কথায় বিজ্ঞান

আকাশ ভরা সূর্য তারা
জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শিশু সাহিত্য সংসদ,
কলকাতা-৯,
দাম : দশ টাকা

আকাশে কত তারা, কত গ্রহ-উপগ্রহ। তাদের সঙ্গে শিশুদের দেখার জন্য দূরবিনের প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ে তাই দূরবিনের কথা লেখা হয়েছে। তারা কীভাবে চিনতে হয় সে-কথা জানানো হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। রাশিচক্র, তারারা কত দূরে, তারারা কত বড়—এই ধরনের নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে সহজ, সরলভাবে। পড়তে ভাল লাগে, সেইসঙ্গে অনেক কথা জানাও হয়ে যায়।

বন যদি না থাকত
সরিৎশেখর মজুমদার
শিশু সাহিত্য সংসদ,
কলকাতা-৯
দাম : দশ টাকা।

মনে হবে রূপকথার গল্প। তবে জরুরি কিছু বক্তব্যও এই গল্পে আছে। বন না থাকলে পৃথিবীটা মরুভূমি হয়ে যেত। সুতরাং বনসংরক্ষণ করা দরকার। বনসৃজনের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। গল্পের ছলে এই কথাটাই বলা হয়েছে। সুব্রত চৌধুরীর আঁকা ছবি বইটিকে সুন্দর করেছে।

হেমেন্দ্রকুমারের নিবন্ধ

হেমেন্দ্রকুমার রায়
প্রবন্ধ সঙ্কলন
সঙ্কলক দেবীপ্রসাদ ঘোষ
আগামী, কলকাতা-৯
দাম : ৪০ টাকা।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্য রোমাঞ্চের গল্প সব বয়সের পাঠকই ভালবাসে। কিন্তু এর বাইরেও হেমেন্দ্রকুমারের আরও অনেক লেখা আছে। নাটক, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নৃত্য—কত বিষয়েই না তিনি লিখেছেন। তাঁর এরকমই কিছু লেখা সঙ্কলিত হয়েছে এই বইয়ে। রবীন্দ্রনাথের নাটক, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, চলচ্চিত্রমহলে লেখকের স্থান কোথায়, ভারতীয় নৃত্যের বৈচিত্র্য, সেকালের কলকাতায়, তখনকার ফুটবল—লেখাগুলি হেমেন্দ্রকুমারের বহুমুখী প্রতিভাকে নতুন করে চিনিয়ে দেবে।

নানারকম

ধাঁধা

ছোটকা যে নানান সমস্যার মুশকিল আসান, সে-কথা কী করে যেন এখন বহু দূরের লোকজনও জেনে গিয়েছে। অনেকেই পরামর্শ করতে আসে ছোটকার সঙ্গে। কেউ পাড়ার লোক, কেউ অন্য পাড়ার। কেউ অফিসের সহকর্মীর চেনা, কেউ আত্মীয়স্বজনের। আর যেটা অবাক লাগে, ছোটকা কাউকেই

বিফলমনোরথ অবস্থায় ফেরায় না। চুপ করে শোনে। সময় নিয়ে সমস্যাটা সমাধানের চেষ্টা করে।

যেমন আজ সকালে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এসেছিলেন। তাঁর সম্পত্তি চার ছেলের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। কিন্তু সমান ভাগ নয়। ভদ্রলোকের বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ। বড় ছেলে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, সুতরাং সে কম পাবে। ছোটটি সবে এম-এ পাশ করেছে। তাই তাকে বেশি দেবেন। এভাবেই ভাগ হবে অন্য দুই ছেলের মধ্যে। ভদ্রলোক এ-ব্যাপারেই কথা বলে গেলেন।

তা ভদ্রলোক কত টাকার সম্পত্তি ভাগাভাগির জন্য ছোটকার পরামর্শ চাইতে এসেছিলেন জানি না। ছোটকা আমাকে বলল, "হাজার-হাজার টাকার হিসেব তোমাকে শোনাব না সতুবাবু, তুমি একটা ছোট মাপের সমস্যা নাও। সমাধান করে আমাকে জানালেই একটা দুর্দান্ত বই উপহার পাবে।"

কী বলল ছোটকা, শুনবে? শোনো তা হলে।

প্রথম ধাঁধা ॥ পঁয়তাল্লিশ টাকা চারজনের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। এমনভাবে ভাগ হবে যে, প্রথমজনের ভাগের সঙ্গে দু' টাকা যোগ করলে, দ্বিতীয়জনের প্রাপ্য থেকে দু' টাকা বিয়োগ করলে, তৃতীয়জনের অংশকে দুই দিয়ে গুণ করলে এবং চতুর্থজনের পাওনাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে, চারটে ভাগই, উত্তরের দিক থেকে, সমান হবে। তা হলে, কে কত পাবে?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ দুটো ঘড়ি। একটা রোজ পাঁচ মিনিট

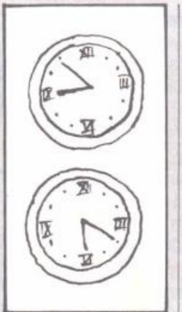

স্লো যায়, অন্যটা বন্ধ হয়ে আছে মেরামতির অপেক্ষায়। কোনটা অপেক্ষাকৃত ভাবে ঠিক সময় জানাবে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—
খাফিনাসামুর

গতবারের উত্তর ॥ ১। যে-ঝুড়িতে ২৯টি ডিম, সেটাই বিক্রি করে দিয়েছিল ডিম-বিক্রেতা। বাকি ঝুড়িগুলোর মধ্যে হাঁসের ডিম ছিল দুটি ঝুড়িতে—যার একটিতে ১৪টি ডিম, অন্যটিতে ৬। অর্থাৎ ২০টি হাঁসের ডিম। মুরগির ডিম ছিল ১২, ৫ ও ১২ ডিমের ঝুড়িতে। অর্থাৎ মুরগির ডিম ছিল ৪০টি। হাঁসের ডিমের দ্বিগুণ সংখ্যক। (২) বাইরের দিকে। (৩) ধূলিপটল। মানে? উড়ছে যে ধুলোরাশি।

সত্যসন্ধ

মজার খেলা

এবারের মজার খেলাটা গতবারের মজার খেলার থেকেও আরও একটা নতুন ধাপ। যারা গতবারের খেলাটা শেখোনি তারা প্রথমে উপকরণ তৈরি করে নাও।

পিসবোর্ড থেকে লুডোর ঘুঁটির মাপে ১২টা ঘুঁটি কাটো। তারপর ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে ১ থেকে ১২ পর্যন্ত সংখ্যা কেটে ১২টা ঘুঁটির উপর সেঁটে দাও। এবার, আর-একটা বড় পিসবোর্ডে সাদা কাগজ সেঁটে তার উপরে নীচের ছবির মতন একটা ছবি এঁকে নাও।

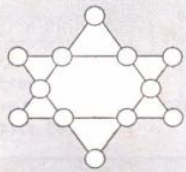

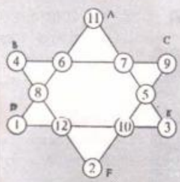

গতবার আমরা শিখেছিলাম, ১ থেকে ১২ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর ঘুঁটি এই ছবির ১২টা ঘরে এমনভাবে বসাতে হবে যে, প্রত্যেক লাইনের চারটে বৃত্তের যোগফল যেন ২৬ হয়। এই উত্তরে সব ঠিক আছে, কিন্তু এবার যদি বলা হয় যে, শুধু এক লাইনে থাকা চারটে বৃত্তের যোগফলই ২৬ হলে চলবে না, শীর্ষে থাকা বৃত্তগুলোর যোগফল পর্যন্ত যেন ২৬ হয়, তা হলে? তা হলে তো এভাবে সাজালে চলবে না। কেননা, A, B, C, D, E, F,-এ রাখা সংখ্যাগুলোর যোগফল ১১+৪+৯+১+৩+২=৩০। এটাকেও ২৬ করতে গেলে কীভাবে সমস্ত সংখ্যা প্রায় বদলে ফেলবে অবস্থান, সেটা এবার ভেবে বার করো। এটাই এবারের মজার খেলা, মজার সমস্যা। তবে হ্যাঁ, চেষ্টা করেও যারা নিজেরা পারবে না, তাদের জন্য সমাধান দেওয়া থাক একটা। অন্যদের জন্য বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। বুঝেছ? সুতরাং, আগে নিজের চেষ্টা। পরে সমাধান দেখা।

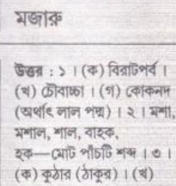

মজারু

কত কথা

প্রথমে তিনটে কথার মারপ্যাঁচের প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি। বেশি ভাবলে চলবে না, চটপট উত্তর দিতে হবে কিন্তু!

(ক) মহাভারতের কোন পর্ব খুব বড়?
(খ) কোন বাচ্চা শুধু জল খেয়ে থাকে?
(গ) কোন নদ লাল?

২। 'মশালবাহক' শব্দটির

মধ্যে পর-পর মোট ক'টি এবং কী-কী শব্দ পাওয়া যেতে পারে?

৩। তিনটি শব্দ তৈরির সূত্র দেওয়া হল। এই সূত্র অনুযায়ী শুধু শব্দ তৈরি করলেই চলবে না, সেই শব্দ-তিনটির অক্ষর উলটে-পালটে তিনটি অন্য শব্দও তৈরি করতে হবে।
(ক) পরশুরামের অস্ত্র। (খ) মাঠে ফলে। (গ) গৃহ, আলয়।

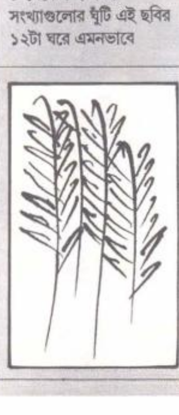

উত্তর : ১। (ক) বিরাটপর্ব। (খ) চৌবাচ্চা। (গ) কোকনদ (অর্থাৎ লাল পদ্ম)। ২। মশা, মশাল, শাল, বাহক, হক—মোট পাঁচটি শব্দ। ৩। (ক) কুঠার (ঠাকুর)। (খ) ফসল (সফল)। (গ) সদন (সনদ)।

কথক

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

মামণি বলো একটা ২০০ গ্রাম সিবাকার প্যাকেট নিয়ে আসতে । ভেতরে দারুণ সুন্দর একটা ছোট্ট জানোয়ার পাবে ।

Trikaya Grey HCG.6.90 BEN

ANANDAMELA 21 MARCH 1990 REGD.NO.
WB CC 264 MH BY SOUTH 683 TN MS(C) 731

অনেক কথাই
বলতে পারেন
কোন কথাই
না বলে

চাই শুধু একমাথা কেয়ো-কার্পিন চুল

শিখে নিন কি করে এই স্টাইলে চুল বাঁধবেন :

ভালো করে চুল আঁচড়ে একগোছা চুল নিন।

সমান মাপে কাটা রঙীন উলের টুকরো থেকে একটি নিয়ে তার মাঝখানটা দিয়ে চুলে গেরো বাঁধুন।

উলের টুকরোটি দিয়ে একটি 'বো' বাঁধুন।

সারা মাথা একইভাবে রঙীন উলের ফুলে ভরে দিন।

আপনার ছোট্ট মেয়েটির চুলের স্টাইল দেখে ওর সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যায়। কিন্তু যে কোন স্টাইলেই ভাল দেখাতে হলে ওর চাই একমাথা চুল।

কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েলে চুল থাকে ঘন, কালো, রেশমী। খুস্কিও হয় না, ডগাও ফাটে না। রোজ কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল মাখলে চুলপড়া বন্ধ হয়।

এবার আপনার সোনামণির একমাথা কেয়ো-কার্পিন চুল যেমন খুশি বাঁধুন। দেখুন ওকে কি সুন্দর দুষ্টু-মিষ্টি দেখায়।

সুস্থ চুল। সুন্দর চুল। কেয়ো-কার্পিন চুল।

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল
চুল চটচটে করে না

Dey's®

দে'জ মেডিক্যাল
যাদের যত্নই আপনার আস্থা

TSA-C/DMHO/389/BN